বৈদিক ধর্ম ধারা

পণ্ডিত সিদ্ধগোপাল কবিরত্ন

ओ३म्

भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।
भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।

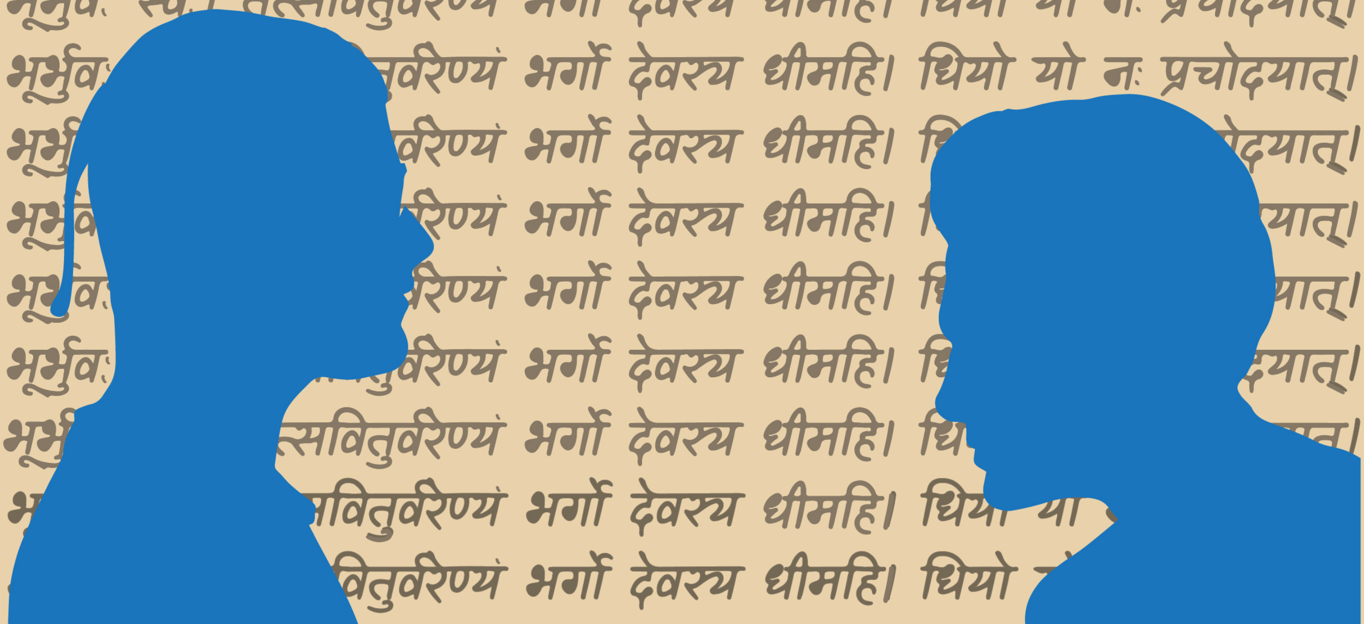

সৌজন্যে বাংলাদেশ অগ্নিবীর

॥ওওম্॥

বৈদিক ধর্ম ধারা

পণ্ডিত সিদ্ধগোপাল কবিরত্ন

'দো বহিনো কী বাতেঁ' পুস্তকের বঙ্গানুবাদ

"বৈদিক ধর্ম ধারা" নামে প্রচারার্থ

প্রকাশ করা হইল।

॥ প্রকাশক ॥

আর্ষ সাহিত্য প্রচারট্রাষ্ট

৪২৭, গলী মন্দির ওয়ালী, নয়া বাঁস দিল্লী-১১০০০৬

দূরভাষ : ৪৩৭৮১১৯১, 23985545

চলভাষ : 9650522777, 9650622775

মূল লেখক

পণ্ডিত সিদ্ধগোপাল কবিরত্ন

বৃন্দাবন মার্গ, মথুরা, উত্তর প্রদেশ

ভাষান্তরকারী

প্রিয়দর্শন সিদ্ধান্তভূষণ বেদোপদেশক

সম্পাদকঃ

সতীশ চন্দ্র মণ্ডল (পুরাতন)

মূল্যঃ ২০ টাকা মাত্র

নতুন পিডিএফ নির্মাণ ও সম্পাদনা- সৌরভ নন্দী (আর্য)

(বাংলাদেশ অগ্নিবীর)

প্রচ্ছদ নির্মাণঃ- বন্ধন বিশ্বাস

ভাষান্তরকারীর দু'একটি কথা

সিদ্ধগোপাল 'কবিরত্ন' আজ লোকান্তরিত। তিনি "দো বহিনো কী বাতেঁ" নামক পুস্তকখানি বহু পরিশ্রম করিয়া রচনা করেন। বইখানি হিন্দি ভাষায় লিখিত। বইখানি যে জনপ্রিয়, পঞ্চম সংস্করণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমি বহু কর্মের মধ্যে ইহাও একটি কর্ম মনে করিয়া, বঙ্গবাসী জনসাধারণের বোধগম্য কথ্যভাষায় ভাষান্তর করি। কয়েক স্থানে অল্প বিস্তর পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে বাধ্য হইয়াছি। কেননা, বঙ্গভাষাভাষী বাঙালীদের মধ্যে বৈদিক ভাব-ধারা প্রচার করিতে হইলে অনুকুল নামকরণও করাও প্রয়োজন। অন্যথা রুচিবিরুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। তাই পুস্তকের নামটি "দো বহিনো কী বাতেঁ" পরিবর্তন করিয়া 'বৈদিক ধর্মধারা' রাখা হইয়াছে।

বিষয়টি সুবোধগম্য হওয়ার শ্রেয় মূল লেখক পণ্ডিত সিদ্ধগোপাল কবিরত্ন মহাশয়ের, আর যেখানে ভাষান্তরিত হওয়ায় বিষয়টি বোধগম্য হয় নাই উহা আমার অক্ষমতা। পাঠক অবশ্যই আমার অক্ষমতার কথা উপেক্ষা করিয়া যথাসাধ্য বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করিবেন ইহাই অনুরোধ। যাহা সত্য এবং যাহা অসত্য তথা যাহা বিজ্ঞান সম্মত ও সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ ইহাতে তাহাই প্রকাশ করিয়া পন্ডিত সিদ্ধগোপাল কবিরত্ন মহাশয় ধন্যবাদার্হ রূপে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

ইতি

ভাষান্তকারী—প্রিয়দর্শন সিদ্ধান্তভূষণ

নতুন পিডিএফ নির্মাণের উদ্দেশ্য

প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সনাতন ধর্মকে জানতে হলে বেদাদি শাস্ত্র পড়া ছাড়া আর কোন গতি নেই। কিন্তু বেদাদি শাস্ত্রের নিগুঢ় তত্ত্বকে সহজে উপলব্ধি করতে চাইলে, বেদাদি শাস্ত্র ও আর্য জীবনদর্শন সম্পর্কে একনজরে ধারনা লাভ করতে চাইলে এবং একই সাথে বৈদিক সনাতন ধর্মের সাথে অন্য সকল প্রচলিত মত মতান্তরের একটি তুলনামূলক ধারনা লাভ করার জন্য মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী রচিত সত্যার্থ প্রকাশ এক অমর গ্রন্থ।

সত্যার্থ প্রকাশের তুলনা আর্যসমাজ থেকে প্রকাশিত কোন বইয়ের সাথেই হয়না। কিন্তু আমার মতো বৈদিক দর্শনের শিক্ষানবিশরা চাইলে সত্যার্থ প্রকাশের আগে এই বৈদিক ধর্মধারা নামক বইটি পড়ে নিতে পারেন, এতে করে সত্যার্থ প্রকাশের কিছু মূল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ক্ষুদ্র কিন্তু স্পষ্ট ও যুক্তিনির্ভর একটা ধারনা হতে পারে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমার মতে, এই বইটি বৈদিক দর্শন শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা আদর্শলিপি বা বর্ণপরিচয়ের মতো বই।

মূল্যবান এই বইটির পুরনো সংস্করণে বেশ কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থাকায় নতুন করে এর আরো একটি ‘অনলাইন’ সংস্করণ বানানো হলো। বইয়ের এক স্থানে সত্যার্থ প্রকাশের কিছু অংশ জানা আবশ্যক বলে অধ্যায়ের শেষে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছি । আশা করি মূল বইয়ের উপর তার প্রভাব

পড়েনি। আমার যোগ করা অংশ অধ্যায়ের শেষে আলাদাভাবে উল্লেখ করা আছে। নতুন সংস্করণের প্রচ্ছদ নির্মাণ করেছে স্নেহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বন্ধন বিশ্বাস। তার প্রতি রইলো অশেষ কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে এই সংস্করণেও কোন মুদ্রণপ্রমাদ থাকলে তা মার্জনাপূর্বক মূলভাব গ্রহনের অনুরোধ রইল। বইটি পড়ে কেউ বৈদিক দর্শনকে জানার আগ্রহ পেলেই আমি সার্থক হব। ঈশ্বর আমাদের সবাইকে সঠিক জীবনাদর্শে চালিত হওয়ার প্রেরণা দান করুক। ওতম্ কৃণ্বন্তোবিশ্বমার্যম।

বিশেষ সতর্কীকরণঃ

এই সংস্করণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। কোনপ্রকার বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে এর ব্যাবহার বিশেষভাবে নিষেধ করা হলো তবে, বিনামূল্যে সরবরাহের জন্য এই বইয়ের 'অনলাইন কপি' অথবা 'প্রিন্টেড কপি'-র ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকরী হবে না।

ইতি

সৌরভ নন্দী (আর্য)

সূচিপত্র

১.ঈশ্বর আছে, না-নেই ?

২.ঈশ্বর কি সৃষ্টিকর্তা ?

৩. ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কেনো ?

৪.ঈশ্বর সাকার নয় কেনো ?

৫. ঈশ্বরকে কিভাবে মনে করব ?

৬.ঈশ্বর ন্যায়কারী অথবা দয়ালু ?

৭.ভূত প্রেত কী বস্তু ?

৮.সুখ দুঃখ কি গ্রহের ফেরে হয় ?

৯.শ্রাদ্ধ করা উচিত না অনুচিত ?

১০.হবন যজ্ঞ এবং যজ্ঞোপবীত

১১.বর্ণব্যাবস্থা জন্ম অনুসারে-- না, কর্মানুসারে ?

১২."নমস্তে" কোথা হতে এল ?

১৩.মাংস খাওয়া উচিত না, অনুচিত ?

১৪.সমগ্র সৃষ্টি কি ঈশ্বর রচিত ?

আর্যসমাজের সংস্থাপক - মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩)

বৈদিক ধর্ম ধারা

ঈশ্বর আছে, না-নেই ?

(প্রথম দিন)

কমলঃ বিমলদা! তুমি প্রায়ই বলে থাকো -"নিত্য ঈশ্বরের প্রার্থনা করবে।" আমি জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা বলতো, ঈশ্বর কোথায় আছেন যে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করব ?

বিমলঃ কেনো? ঈশ্বর তো সব জায়গায় আছেন। এমন কোনো স্থান নেই যেখানে তিনি নেই।

কমলঃ এ এক ভালো কথা শুনালে দাদা। আচ্ছা বলতো, — ঈশ্বর যদি সর্বত্রই আছেন আর থাকেন, তাহলে আর সব জিনিষগুলো থাকবে কোথায় ? ঈশ্বর তো সমস্ত স্থান জুড়েই নেবেন। যদি ঈশ্বর ছাড়া কোনো স্থান খালি না থাকে, তাহলে অন্য জিনিষগুলো কি বিনা স্থানে থাকবে?

বিমলঃ না রে ভাই, ঈশ্বর ছাড়া কোনো স্থান খালি নেই একথা বলার উদ্দেশ্য হলো এই যে, সর্বত্র তার অস্তিত্ব আছে। এই সাধারণ কথাটা বলতে হলে ঐ ভাবেই বলতে হয়— ঈশ্বর ছাড়া কোনো স্থান খালি নেই,

বুঝলে? শোনো, ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোনো স্থানকে অধিকার করে থাকে না, প্রকৃতিই (Material) স্থান অধিকার করে থাকে। পৃথিবী, অগ্নি, জল, বায়ু, তথা তাদের পরমাণু, এরাই স্থান অধিকার করে থাকে। ঈশ্বর, ঐ সমস্ত পদার্থে ব্যাপক। তাই বলা হয়,—ঈশ্বর সর্বত্র আছেন।

কমলঃ বেশ, ভাল কথা। কিন্তু ঈশ্বর যদি সর্বত্র বিদ্যমান, তাহলে তাঁকে দেখা যায় না কেনো? যখন তাঁকে দেখা যায় না, সে অবস্থায় সব স্থানে তাঁর থাকার প্রমাণ কী?

বিমলঃ তুমি কি বলতে চাও যে, যে বস্তু চোখে দেখা যায় না, সে বস্তুটাও থাকে না? জগতে এমন বহু পদার্থ আছে যার অস্তিত্ব আছে, অথচ তাকে দেখা যায় না। যেমন নাকি — শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, সময়, দিক, ক্ষুধা, পিপাসা, সুড়সুড়ি, ব্যথা ইত্যাদি। কোনো বস্তুর দৃশ্যমান হওয়ার বহু কারণ থাকতে পারে এবং থাকেও। জগতে থেকেও যা দূরে আছে তা কিন্তু দেখা যায় না। যথা,—ইউরোপ, আমেরিকা, বহু দূরে উড্ডীয়মান ঘুড়ি বা পাখী। আবার এমন জিনিষও আছে যা অত্যন্ত নিকট থেকেও দেখা যায় না, যেমন নাকি,— চোখ, চোখের কাজল। এমন বহু জিনিষ আছে, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অথচ দৃশ্যমান নয়, যথা—পরমাণু। ঠিক তেমনি অনেক প্রকার কীটাণু যাদের অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। দর্পণে ময়লার আবরণ থাকায় প্রতিচ্ছবি দেখা যায় না। প্রাচীর থাকার জন্য প্রাচীরের অপর পারের মানুষকে দেখা যায় না। এমন বহু জিনিস আছে যাদের মধ্যে কোন একটি গুণের সমানতা থাকার দরুণ তাকে দেখা যায়

না। যথা— দুগ্ধে জল। কেননা, এরা উভয়েই তরল পদার্থ। এমন বহু জিনিস আছে যা চোখের দোষে দৃষ্টিগোচর হয় না, যথা— পীত রোগে শ্বেত বর্ণ। তাই, যারা বলে যে, যা দেখা যায় না অর্থাৎ দৃশ্যমান নয়, তার অস্তিত্ব নেই, এ কথা বলা মহা ভুল।

কমলঃ দাদা! সত্যি বলতে কি, না দেখলে আমার তো বিশ্বাসই হয় না।

বিমলঃ এটা তোমার হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। আমি পূর্বেই বলেছি যে, এমন বহু জিনিষ আছে যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তা আছে, সে কথা তোমায় বিশ্বাস করতেই হবে। আচ্ছা বলতো, আমি যা বলছি, তুমি তা শুন্‌ছ,—না, শুন্‌ছ না?

কমলঃ হ্যাঁ শুন্‌ছি বৈকি।

বিমলঃ কী দিয়ে শুন্‌ছ?

কমলঃ কান দিয়ে শুন্‌ছি।

বিমলঃ যে শব্দটা উচ্চারিত হচ্ছে, তা আছে, — না, নেই?

কমলঃ কেনো থাকবে না? – আছে।

বিমলঃ তাহলে বলতো, সেই উচ্চারিত শব্দটাকে দেখতে পাচ্ছ না কেনো? আরও বলি শোনো। আমার হাতে এই যে ফুলটা দেখছো, বলতো এটা কী ফুল?

কমলঃ এটা গোলাপ ফুল।

বিমলঃ এতে সুগন্ধ আছে, – না নেই ?

কমলঃ হ্যাঁ, এতে সুগন্ধ আছে ।

বিমলঃ কী ভাবে জানলে যে, এতে সুগন্ধ আছে ?

কমলঃ কেনো, নাক দিয়ে শুঁকে জানলাম।

বিমলঃ আর এক কথা। আচ্ছা বলতো, রাত্রে তুমি যে দুধটুকু খেয়েছিলে তাতে চিনি ছিল,—না, ছিলনা ?

কমলঃ ছিল ।

বিমলঃ তা' তুমি জানলে কী করে ।

কমলঃ জিভ দিয়ে।

বিমলঃ এবার আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি। বলতো, শব্দ-জ্ঞান কান দিয়ে হয়, সুগন্ধের জ্ঞান নাক দিয়ে, আর চিনির জ্ঞান জিভ দিয়ে কেনো হলো ? চোখ দিয়ে শব্দের, কান দিয়ে সুগন্ধের, আর নাক দিয়ে মিষ্টতার জ্ঞান হলো না কেনো ? গন্ধ এবং মিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও, চোখ কেনো তা দেখল না?

কমলঃ যে ইন্দ্রিয়ের যা বিষয়, সে সেই বিষয়ের জ্ঞানই লাভ করেছে। কিন্তু ঈশ্বরকে যখন কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না, এমতাবস্থায় তাঁকে কী দিয়ে জানা যাবে যে, এ তিনি ।

বিমলঃ তোমার প্রশ্ন ছিল যে, যেহেতু ঈশ্বর দৃশ্যমান নহেন, অতএব তিনি নেই। দেখতে না দেখতে তুমি তোমার কথা বদলে দিচ্ছ দেখি। যাই হোক্, একথা তো তুমি স্বীকার করে নিলে যে, যে জিনিস চোখ দিয়ে দেখা যায় না, সে জিনিষেরও অস্তিত্ব থাকে। একথা পৃথক্ যে, তা জ্ঞানচক্ষু ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয় দ্বারাও জানা সম্ভব। এবার তুমি একথা স্বীকার করছ যে, ঈশ্বরকে কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা যখন জানা যায় না, এ অবস্থায় তুমি কেমন করে স্বীকার করবে — এই তিনি?

এবার বলো — ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না বলে, তুমি যখন ঈশ্বরকে স্বীকার করছ না, তখন এ অবস্থায় তুমি ইন্দ্রিয়গুলোকেই বা কেমন করে জানলে? যদি বলো, কেনো, ইন্দ্রিয় সমূহকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানতে পারা যায়, তাহলে তো আত্মাশ্রয় দোষ হয়ে যাবে। কেননা, যে কোনো দ্রষ্টা, সে নিজে দৃশ্যমান হতে পারে না। ইন্দ্রিয় সমূহের বিষয় যে ভিন্ন ভিন্ন। চোখের – রূপ, কানের — শব্দ, নাসিকার — গন্ধ, জিহ্বার — রস এবং ত্বকের — স্পর্শ, এগুলো ইন্দ্রিয়ের আপন আপন বিষয়। নাক, চোখকে জানতে পারে না, জিহ্বা, কানকে জানতে পারে না।

কমলঃ বেশ তো বললে! কেনো জানতে পারবে না? যখন আমি আয়না হাতে নিই, তখন তাতে চোখ, মুখ, কান, জিভ এই সমস্ত ইন্দ্রিয় তো দেখা যায়। চোখ এমন একটি ইন্দ্রিয়, যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান করিয়ে দেয়।

বিমলঃ ভাইটি ! এ তোমার ভুল ধারণা। তুমি চোখ দিয়ে যা কিছু - দ্যাখো, সে তো রূপ। অন্য ইন্দ্রিয় বা তাদের বিষয়কে তো দেখতে

পাওনা, আয়নায় ইন্দ্রিয় দেখা যায় কে বলল? যা দ্যাখো সে তো ইন্দ্রিয় গোলক অর্থাৎ রূপবান স্থানকে দেখতে পাও। ইন্দ্রিয় সমূহ তো সেই সব স্থানে শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে। চোখের পক্ষে সমগ্র ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান করান তো দূরে থাক্, চোখ তো নিজে নিজেকেই দেখতে পায়না। আর যদি তোমার এই ধারণা জন্মে থাকে যে, আয়নায় চোখ দেখা যায়, তাহলে আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা বলতো, আমার হাতে কী আছে ?

কমলঃ আয়না।

বিমলঃ আয়না। ভাল কথা, একে কী দিয়ে দেখলে ?

কমলঃ চোখ দিয়ে।

বিমলঃ বেশ। চোখ দিয়ে আয়নায় দেখছ, কেমন ? তাহলে তো আয়নায় চোখ দেখার পূর্বে তোমাতে চোখের জ্ঞান ছিল। এর অর্থ এই হলো যে, যদি চোখ না থাকত তাহলে আয়নাতে দেখতে পেতে না। এবার বলো তো দেখি, চোখ দ্বারা আয়নার জ্ঞান হয়, না — আয়না দ্বারা চোখের জ্ঞান হয়ে থাকে ? যদি বলো, আয়না দ্বারা চোখের জ্ঞান হয়, তাহলে চোখ কানা হয়ে গেলে আয়না অবশ্যই নষ্ট চক্ষুর জ্ঞান করিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু চোখ নষ্ট হয়ে গেলে, আয়না সে চোখের জ্ঞান করাবে কেমন করে? সে তো নিজেই তার জ্ঞান লাভ করতে পারে না। আর যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা কর, তাহলে দেখবে যে, চোখ যা

দ্যাখে, তা সাধনের সহায়তায় দ্যাখে, স্বতন্ত্রভাবে দ্যাখে না। কিন্তু একথা ঠিক্ যে, চোখ ব্যতীত রূপের জ্ঞান হতে পারে না, কেননা রূপের জ্ঞানও চোখ নিজে নিজে করতে পারে না।

কমলঃ জিজ্ঞাসা করছ, চক্ষুর কোন্ কোন্ সাধনের প্রয়োজন হয় ? কেননা, চোখ তো স্বাধীনভাবেই দেখে থাকে। চোখের বিষয়ই তো দর্শন করা। আচ্ছা, বিমলদা,—চোখ সাধন ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে দেখতে পারে না কেনো ?

বিমলঃ তো শোনো। আমি এ সময় সব কিছু দেখছি কিন্তু যদি ঘন অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে যায়, তাহলে আমি এই সমস্ত বিষয় দেখতে পাব, না—পাব না ?

কমলঃ না। দেখতে পাবে না।

বিমলঃ তাহলে জানা গেল যে, কোনো বস্তুকে দেখতে হলে কেবল চোখেরই প্রয়োজন হয় না, আলোরও প্রয়োজন হয়। আলো যদি না থাকে, তাহলে চোখ থাকতেও অন্ধ। শুধু তাই নায়, আলোও আছে, তাতেও দেখতে পাই না। কেননা, দ্রষ্টব্য বস্তুর এক নির্দিষ্ট স্থানে থাকাও প্রয়োজন। দ্যাখো, এ একটা বই। যদি আমি এক মাইল দূর হতে বই-এর অক্ষর দেখতে চাই, তাহলেও আমি বইয়ের অক্ষর দেখতে পাব না। আর যদি চোখের উপরেই বইয়ের পাতা লাগিয়ে রাখি, তাহলেও বইয়ের অক্ষর দেখতে পাব না। অক্ষর দেখবার জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে বই থাকা

চাই, তবে তা দেখতে বা পড়তে পারা যাবে। আবার দ্যাখো,— চোখ, আলো এবং নির্দিষ্ট দূরত্বে বই থাকা সত্ত্বেও তা দেখা যায় না, চোখের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ থাকা চাই। মন যদি অন্য কোনো বিষয়ে যুক্ত থাকে, সে অবস্থায় চোখের সামনে দিয়ে কোনো কিছু চলে গেলেও চোখ তা দেখতে পায় না। প্রায়ই এমনও দেখা যায় যে, চোখের সামনে দিয়ে কোনো কিছু চলে গেল, তারপর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে – তুমি কি এখন কিছু যেতে দেখেছ ? উত্তর পাবে—"কই, তা তো দেখিনি।" এবার তুমি নিশ্চয়ই বুঝেই যে, দেখতে হলে কতটা সাধনের প্রয়োজন হয়।

কমলঃ তুমি যে এত কথা শোনালে, এর অর্থ কী ? কেনো এত কথার অবতারণা করলে বলতো ?

বিমলঃ এতেও বুঝলে না? এর মানে হলো, ঈশ্বরকে যেমন কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না, তেমনি ইন্দ্রিয়কেও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না। ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা না জানা গেলেও, তোমায় স্বীকার করতে হবে যে, ইন্দ্রিয় আছে। যদি তাই হয়, তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে তোমার সন্দেহ কীসের বলো ?

কমলঃ ইন্দ্রিয় সমূহকে কীভাবে জানা যেতে পারে ?

বিমলঃ জীবাত্মার অনুভূতি দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে জানতে পারা যায় কেননা, যখন জীব—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ জ্ঞান লাভ করতে থাকে, তখন সে জানতে পারে যে, তার কাছে এর সাধন আছে। যাকে

দিয়ে সে কাজ করিয়ে নিচ্ছে, সেই সমস্ত বিষয় জানার সাধনই তো ইন্দ্রিয়।

কমলঃ তাহলে ঈশ্বরকে কেমন করে জানা যায় ?

বিমলঃ ঈশ্বরকে অনুভূতি দ্বারা জানা যায়।

কমলঃ অনুভূতি হবে কোথায় ?

বিমলঃ ঈশ্বরের অনুভূতি হয় আত্মায় ।

কমলঃ এ অনুভূতি হয় কখন ?

বিমলঃ যখন মনের ত্রিদোষ ঘুচে যায় তখন ঈশ্বরের অনুভূতি হয় ।

কমলঃ ত্রিদোষ আবার কী ?

বিমলঃ মল, বিক্ষেপ, এবং আবরণ এই তিনটি দোষকে ত্রিদোষ বলে।

কমলঃ মল, বিক্ষেপ এবং আবরণ কাকে বলে ? এদের পরিভাষাই বা কী?

বিমলঃ মনের মধ্যে অপরের অনিষ্ট চিন্তা করা তথা আত্মায় পাপের সংস্কার পড়াকে ‘মল’ বলে। সদাসর্বদা বিষয় চিন্তন অথবা মনকে সদা চঞ্চল রাখাকে ‘বিক্ষেপ’ বলে । জগতের যাবতীয় নাশবান পদার্থের অভিমান মনের উপর পর্দার মত পড়ে থাকাকে ‘আবরণ’ বলে ।

কমলঃ এই তিন প্রকার দোষকে কী উপায়ে নাশ করা যায় ?

বিমলঃ ত্রিদোষ দূর করার তিনটি সাধন।

কমলঃ কী কী?

বিমলঃ জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনা।

কমলঃ জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনার মানে কী?

বিমলঃ ■ যে পদার্থ যেরূপ তাকে সেই রূপ মনে করা অর্থাৎ জড় বস্তুকে জড়, চেতনকে চেতন, নিত্যকে নিত্য এবং অনিত্যকে অনিত্য জানা হলো 'জ্ঞান'।

■ শরীর, সমাজ তথা আত্মার উন্নতি করা, অভিপ্রেত পদার্থ সমূহ লাভ করার জন্য পুরুষার্থ করাকে 'কর্ম' বলে।

■ পদার্থের সমীপে গিয়ে, তার গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করা এবং আপন দোষ সংশোধন করার নাম 'উপাসনা'।

কল্পনা কর, একজন শীতে কাতর বা শীতার্ত। সে যদি শীত হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য জলের কাছে যায়, তাহলে তাকে অজ্ঞানী বলা হয় কিনা? এটা তার অজ্ঞানতা যে, শীত নিবারণ করার জন্য সে জলের সমীপস্থ হচ্ছে। একে জ্ঞান বলে না। শীত তখনই দূর হতে পারে। যদি তার মধ্যে প্রথম থেকেই অগ্নির বিষয়ে জ্ঞান থাকে। তারপর তাকে অগ্নির সমীপস্থ হয়ে শীত রূপী দোষকে অগ্নির যে উষ্ণতা গুণ তা দিয়ে দূর করতে হবে।

অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা মল, কর্ম দ্বারা বিক্ষেপ এবং উপাসনা দ্বারা আবরণ দূর হলে তার পর পরমাত্মার অনুভূতি হবে।

কমলঃ এ বিষয়টিকে আরও একটু পরিষ্কার করে বলনা দাদা! জ্ঞান দ্বারা মল, কর্ম দ্বারা বিক্ষেপ এবং উপাসনা দ্বারা আবরণ দোষ কেমন করে দূর হয়?

বিমলঃ জ্ঞানের দ্বারা জানতে হবে যে, জগতের সমস্ত প্রাণী এবং - সমস্ত পদার্থ নাশবান, এই জন্য অপরের অধিকার ছিনিয়ে নেবার ভাবনা না রাখলেই 'মল' দোষ দূর হবে।

যখন মানুষ সাংসারিক পদার্থ সমূহকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে উপভোগ আরম্ভ করে, তখন তার চিত্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, সেই চাঞ্চল্যকে 'বিক্ষেপ' বলে। বাস্তবিক পক্ষে সাংসারিক পদার্থ সমূহ যে সাধন মাত্র, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সাংসারিক পদার্থ সমূহ লাভ করা জীবনের সাধ্য নয় অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য নয় এই সত্যকে জেনে যে কর্ম করা যায়, সেই কর্ম মানুষকে জলে পদ্মপত্রের ন্যায় সাংসারিক মমতায় লিপ্ত হতে দেয় না।

নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা বিক্ষেপ দূর হয়। মানুষের মনের উপর অহংকার বা অভিমানের আবরণ পড়লে, সে পরমেশ্বরের প্রদত্ত বস্তু সমূহকে আপন মনে করতে থাকে। "আমার ধন, আমার স্ত্রী, আমার জন, আমার রাজ্য, আমার শাসন ইত্যাদি ইত্যাদি।" অভিমানে বশীভূত হয়ে

সে অপরকে পীড়ন করা আরম্ভ করে। সে মনে করতে থাকে, তার মত বড় এ সংসার আর কেউ নেই। কিন্তু যখন সে জ্ঞানপূর্বক কর্ম করে, মন এবং ইন্দ্রিয় সমহূকে বাহ্য বিষয় সমূহ হতে দূরে সরিয়ে শক্তিকে হৃদয়ে একাগ্র করে এবং মনে করে যে, পরমাত্মা তার সমীপে বর্তমান এবং সে পরমাত্মার সমীপে এই রূপ উপাসনা দ্বারা অহংকার অর্থাৎ আবরণ দোষ দূর হয়ে যায়। এইভাবে, ত্রিদোষ দূরীকরণ সাধনা দ্বারা ত্রিদোষ নাশ করার নিরন্তর অভ্যাসই পরমাত্মার অনুভূতি করিয়ে দেয়।

কমলঃ বিমলদা! তোমার বিষয়বস্তুকে বিশদ ভাবে বুঝিয়ে বলার দক্ষতা অতি চমৎকার, তুমি তর্কে বড়ই চতুর যাই হোক আমার জিজ্ঞাসা এই যে, ঈশ্বরকে দিয়ে জগতের কোন প্রয়োজনটা সিদ্ধ হবে?

বিমলঃ ঈশ্বরকে দিয়ে জগতের কোন প্রয়োজনটা সিদ্ধ হবে এই তো প্রশ্ন? দ্যাখো, যদি ঈশ্বর না থাকেন, তাহলে জগৎ সৃষ্টি হবে কেমন করে? এই পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সমূহ, নদ-নদী, হ্রদ, ঝরণা, সরোবর, পাহাড়, পর্বত, বন-উপবন, লতা, পাখী, জলচর, স্থলচর, উভচর, অণ্ডজ, উদ্ভিদ্, জরায়ুজ প্রভৃতি অনেক প্রকার জীব, তথা অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ, কে সৃষ্টি করবে বলো? ঈশ্বর ছাড়া কে এই সব সৃষ্টি করতে সক্ষম?

কমলঃ এই সব সৃষ্টি করতে আবার ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় নাকি? এ সমস্ত সৃষ্টি তো নিজে নিজেই হয়েছে, আর চিরকাল হতেই থাকবে।

বিমলঃ জগতের কোনো পদার্থ স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয় না। এ সমস্ত যদি নিজেই সৃষ্টি হতো, তাহলে পাচক ব্যতীত অন্নাদি, কুম্ভকার ব্যতীত ঘট, স্বর্ণকার ব্যতীত অলংকার, ময়রা ব্যতীত মিষ্টি, দর্জি ব্যতীত জামা-কাপড়, আপনা আপনিই হতো। আর এক কথা, সৃষ্ট বস্তু চিরকাল থাকে না। প্রত্যেক বস্তু উৎপন্ন হয়, বৃদ্ধি হয়, পরিবর্তন হয়, হ্রাস পায় এবং পরিশেষে তার বিনাশ হয়। প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুতে এই ছয় প্রকার বিকার দেখা যায়। বিশাল হতে বিশালতর পর্বত, অতিকায় হতে মহাতিকায় গাছ, বৃহৎ হতে বৃহত্তর পশু তথা জগতের মহান হতে সুমহান এবং ক্ষুদ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্ট, এবং পরিশেষে বিনষ্ট হয়।

কমলঃ কিন্তু দাদা! পরমেশ্বর কোথাও কোন বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা তো কোথাও দেখা যায় না, এরূপ ভ্রম তো চিরকালের। পৃথিবী, জল, বায়ু আর এদের পরমাণু জগতে আছে, আর ঐ সমস্ত এক সাথে সংযুক্ত হয়ে পদার্থ সমূহের সৃষ্টি হচ্ছে আর পরস্পর পৃথক হয়ে বিনষ্টও হচ্ছে। এতে ঈশ্বরের সৃষ্টি করার কী আছে?

বিমলঃ এ ধারণা তোমার ভুল। পৃথিবী প্রভৃতি তত্ত্ব আর তাদের পরমাণু চেতন নয়, তারা তো জড়। তাদের যদি পরস্পর কেউ মিলন না ঘটায়, তারা পরস্পর যুক্ত হবে কেমন করে? এই ভাবে তাদের যদি কেহ পৃথক্ না করে, তারা নিজেরা তো পৃথক হতে পারবে না। সংযোগ এবং বিয়োগ এ দু'টি বিপরীত গুণ। কোনো জড় অর্থাৎ প্রাণহীন পদার্থে এই বিপরীত গুণ থাকা সম্ভব নয়। যদি কোনো পদার্থে তাদের সম্মিলিত হওয়ার

স্বাভাবিক গুণ থাকে, তো তারা কদাপি বিযুক্ত হতে পারবে না। তারা কেবল যুক্ত হয়েই থাকবে। যদি কারো মধ্যে সংযুক্ত হওয়ার স্বাভাবিক গুণ থাকে, তো,— সে সংযুক্ত হয়েই থাকবে। আর যদি পৃথক্ থাকার স্বাভাবিক গুণ থাকে, সে কোনো দিন সংযুক্ত হবেই না।

যদি বলো যে, প্রাকৃতিক তত্ত্বের কিছুটার মধ্যে সংযুক্ত এবং কিছুটার মধ্যে বিযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা থাকবে, সে অবস্থায় তারা জগৎকে কখনও নষ্ট হতে দেবে না এবং যদি বিনষ্ট মূলক তত্ত্বের ক্ষমতা থাকে, তাহলে তারা জগৎকে কখনও গঠন হতে দেবে না। আর যদি বারংবার থাকার স্বভাব থাকে, তাহলে যেখানে দুই তত্ত্ব সংযুক্ত হবে সেখানে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্নও হবে। এরূপ অবস্থায় কোনো বস্তুর নির্মাণ হবে না। কিন্তু জগতে প্রত্যেক বস্তু নির্মিত হয়, স্থির থাকে এবং ধবংস হয়, এই তো আমরা দেখি। প্রকৃতি তত্ত্বে তুমি যত ইচ্ছে গুণের কল্পনা করনা কেনো, সে নিয়মানুসারে উৎপন্ন হবে, স্থির থাকবে, এবং বিনষ্ট হবে। এই যে উৎপত্তি, স্থিতি, এবং বিনাশ, এ ক্রিয়া ঈশ্বর ছাড়া হতে পারে না। জড় এবং চেতনে পার্থক্য কী জানো?

■ প্রথমতঃ—জড় বস্তু, সে স্বভাবতঃ, ত্রিয়াহীন।

■ দ্বিতীয়তঃ — যদি সে চেতনের সাহায্যে কিছু কর্ম করেও, সে একই প্রকারের কর্ম করতে থাকবে। চেতন অর্থাৎ জ্ঞানবান সত্ত্বায় কর্ম করা,

না করা এবং বিপরীত করার শক্তি আছে। এ গুণ চেতন সত্ত্বায় স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান।

কমলঃ কোনো বস্তুর নির্মাতাকে তো প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়। যথা, অলংকার নির্মাতা স্বর্ণকারকে, মিষ্টি নির্মাতা ময়রাকে, ঘটনিমার্তা কুম্ভকারকে, নীড় নির্মাণকারী পাখীকে আমরা তো দেখতে পাই। ঈশ্বর যদি জগৎ নিমার্তা হন, তাকে দেখা যায় না কেনো ?

বিমলঃ বিশ্বাস করো, নিমার্তা অর্থাৎ কর্তাকে কখনও দেখা যায় না তুমি যে বলছ স্বর্ণকার, ময়রা, কুম্ভকার এদের দেখা যায়, একথা সত্য নয়। তুমি হয়ত বলবে কেনো?

আচ্ছা, কেনো তাই বলছি শোনো। কুম্ভকার, স্বর্ণকার ময়রা প্রভৃতি যত প্রকারের কর্তা আছে, তারা দুই প্রকার পদার্থের দ্বারা নির্মিত। প্রথম—নাশবান পার্থিব শরীর, দ্বিতীয়—অমর জীবাত্মা। শরীর জীবাত্মার কোন কাজে লাগে সেটা শোনো। শরীর জীবাত্মার কর্ম করার এক সাধন। যখন জীবাত্মা শরীররূপী সাধনকে কর্মে নিযুক্ত করে, তখনই সে কিছু নির্মাণ করতে সমর্থ হয়। আর যদি সে এই শরীররূপী সাধনকে কর্মে নিযুক্ত না করে, তার দ্বারা তখন কোনো পদার্থ গড়া যায় না। এবার চিন্তা কর—স্বর্ণকার, কুম্ভকার, ময়রা এদের যেটি শরীর,—সেটি তাদের কর্মের যন্ত্র, তা তো দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা শরীর নির্মিত। কিন্তু, জীবাত্মা, যে শরীর সহযোগে কর্ম করে অর্থাৎ কর্তা তাকে তো দেখা যায় না। জীবাত্মা শরীর ব্যতীত কোনো

পদার্থ নির্মাণ করতে পারেনা । কেননা, জীবের শক্তি পরিমিত । এই কারণেই পরমাত্মা তাকে যে শরীর দান করেছেন তা' দৃশ্যমান। পরমাত্মা অসীম, অনন্ত এবং সর্বব্যাপক। তিনি শরীর ব্যতীতই নিজের যাবতীয় কর্ম করে থাকেন। উভয় কর্তাই অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা, কেহই দৃশ্যমান নয় । জীবাত্মরূপী অল্পজ্ঞ কর্তাও দৃশ্যমান নয়, আর পরমাত্মারূপী সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ কর্তাও দৃশ্যমান নন।

কমলঃ যদি পরমাত্মার শরীর না থাকে, তাহলে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন কেমন করে ? শরীর ব্যতীত ক্রিয়া এবং কার্য, উভয়ের কোনটাই সম্ভব নয়।

বিমলঃ এবার বিচার বিনিময় করার সময় পূর্ণ হয়েছে, আগামীকাল আবার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে

কমলঃ বেশ, কালই হোক।

ঈশ্বর কি সৃষ্টিকর্তা?

(দ্বিতীয় দিন)

কমলঃ বিমলদা ! এবার আজ, কালকের প্রশ্নের উত্তর দাও তো দেখি ।

বিমলঃ তোমার কালকের প্রশ্ন ছিল— "যদি পরমেশ্বরের শরীর না থাকে, তাহলে তিনি কেমন করে জগৎ রচনা করেন ? কেননা, শরীর ব্যতীত ক্রিয়া সম্ভব নয়, কার্যও সম্ভব নয় ।"

ভাইটি শোনো। পরমেশ্বরের শরীর না থাকলে তিনি সৃষ্টি করতে পারবেন না, এ ধারণাও তোমার ভুল । কেননা, যেখানে চেতন পদার্থের আবির্ভাব ঘটবে, সেখানে সে ক্রিয়াও করতে পারবে, এবং ক্রিয়াতে গতিও সৃষ্টি করতে পারবে । যেখানে সে উপস্থিত হতে পারবে না সেখানে শরীর প্রভৃতি সাধনের প্রয়োজন হবে । দ্যাখো ! আমি এই বইখানা ধরে তুলছি। বলতো, কী দিয়ে তুললাম ?

কমলঃ হাত দিয়ে তুললে ।

বিমলঃ যদি হাত না থাকত, তাহলে আমি বইটা ধরে তুলতে পারতাম না, পারতাম কি ?

কমলঃ না,—পারতে না।

বিমলঃ বেশ, হাত তো বইটাকে ধরে তুলল, এবার আমি হাত তুলছি,বলতো, হাতকে কে তুলল ?

কমলঃ হাতকে ? হাতকে তো নিজের শক্তি তুলল ।

বিমলঃ আরও বলছি শোনো, আমি আমার সমস্ত শরীরটাকে নাড়াচ্ছি । বলতো, কী দিয়ে নাড়াচ্ছি ?

কমলঃ আপন শক্তি দিয়ে নাড়াচ্ছ ।

বিমলঃ তুমি তো এখনই বলছিলে যে, শরীর ছাড়া কোনো ক্রিয়া হতে পারে না । যদি তাই হয়, তাহলে শরীর ব্যতীত এই শরীরটায় গতি এল কেমন করে? তাহলে বুঝা গেল যে, চেতন এবং তার শক্তি যেখানে যেখানে আছে, সেখানে সেখানে তার শরীরের প্রয়োজন হয় না। জীবাত্মা শরীরের ভিতরে থেকে সমস্ত শরীরকে গতি দিচ্ছে, আর শরীরের বাইরের পদার্থ সমূহে শরীর গতি দিচ্ছে কেননা, জীবাত্মা শরীরের বাইরে উপস্থিত নেই । পরমাত্মা ভিতরে এবং বাইরে সর্বত্র বিদ্যমান, তাই তাঁর শরীরের প্রয়োজন হয় না । পরমাত্মা সমস্ত জগতে ব্যাপক বলে, সমস্ত জগৎকে তিনি গতি দিচ্ছেন ।

কমলঃ আমি তো দেখেছি, মূর্তিমান ব্যক্তিই মূর্তিমান বস্তু নির্মাণ করতে পারে। যথা—ময়রা, স্বর্ণকার ইত্যাদি । নিরাকার পরমেশ্বর কেমন করে জগৎ রচনা করতে সক্ষম হবেন ?

বিমলঃ যত মূর্তিমান কর্তা দেখবে, তাদের সকলে নিজের বাইরের বস্তু নির্মাণে সক্ষম, কিন্তু তারা নিজের ভিতরের বস্তু নির্মাণে অক্ষম। বাইরের বস্তু নির্মাণের জন্য হাত, পা প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, কিন্তু শরীরের ভিতরের জন্য প্রয়োজন হয় না। এই জগতে কোনো বস্তু পরমেশ্বরের বাইরে নেই, তাই তাঁর শরীরের প্রয়োজন হয় না। ময়রা নিজের শরীরের বাইরের বস্তু সমূহ নির্মাণ করে, কিন্তু সে যদি মনে করে যে, সে তার নিজের শরীরের ভিতরের বস্তু সমূহ নির্মাণ করবে, তখন সে বস্তুগুলো খাবে কে? এমতাবস্থায় তার হাত পায়ের প্রয়োজনই বা কী? শরীরের ভিতর রস, মাংস, হাড় প্রভৃতি পদার্থ তো হাত পা ছাড়াই তৈরী হয়ে থাকে।

আর একটা কথা — একটু চিন্তা করে দ্যাখো, ইন্দ্রিয় সমূহ বাইরের বস্তু নির্মাণ করছে, আর চোখ বাইরের বস্তু সমূহ দেখছে। সে যদি ভিতরের বস্তু সমূহ দেখা আরম্ভ করে, তাহলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যাবে। যদি সে ভিতরের জিনিষগুলো দেখা আরম্ভ করে, তাহলে তার অবস্থাটা কেমন হবে ভাবতে পারো? যদি জীব চোখ দিয়ে ভিতরে মল, মূত্র, রক্ত মাংস দেখতে থাকে তাহলে সে যে, ঘৃণায় ছট্‌ফট্ করবে। এ সবই ঈশ্বরের কৃপা যে, ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা শুধু বাইরের বস্তুই দেখা যায় ভিতরে দেখা যায় না।

কমলঃ নির্মাণকর্তা কি নির্মিত বস্তুতেও ব্যাপক হয়ে থাকে ? ঘড়ির নির্মাণকর্তা, সে তো ঘড়ি হতে পৃথক্। ময়রা মিষ্টি তৈরী করল মিষ্টি

পৃথক্,—আর ময়রা পৃথক্। জগতের নিয়মেই এই যে, নিমার্ণকর্তা নির্মিত বস্তু হতে পৃথক্ থাকে। পরমেশ্বর সর্বত্র ব্যাপকও থাকবেন এবং জগৎ রচনাও করবেন এ কেমন উদ্ভট কথা! তাছাড়া তিনি হাত পায়ের সাহায্য ব্যতীতই বস্তু নির্মাণ করবেন, এই বা কেমন কথা – ভেবে পাইনা।

বিমলঃ ঘড়ি নির্মাণ কর্তা, ময়রা স্বর্ণকার প্রভৃতি এরা সকলে একদেশী এবং অল্পজ্ঞ কর্তা। এদের কর্মের যে পর্যন্ত দায়িত্ব আছে, সেই পর্যন্তই তাদের ক্রিয়া এবং তারা সেই সমস্ত পদার্থের সঙ্গে আছে। যেখানে তারা নেই, সেখানে এদের সঙ্গে সম্বন্ধ-রক্ষাকারী ক্রিয়াও থাকতে পারেনা। যথা — ঘড়ি সজ্জাকার ঘড়ির রূপদান করল। সজ্জার উদ্দেশ্য কী? ঘড়ির কলকব্জাগুলোকে পরস্পর যুক্তকরে, তাতে ক্রিয়া দান করা। ঘড়ি-সজ্জাকার ঘড়ির কলকব্জাকে যুক্ত করল, সে কিন্তু কলকব্জার নির্মাণ কর্তা নয়। কলকব্জার নির্মাণ কর্তা অপর কেহ। ঘড়ি সজ্জাকার ঘড়িতে রূপদান করার সময় ঘড়ির সঙ্গে ছিল। যদি সে ঘড়ির কলকব্জার সঙ্গে না থাকত, তাহলে কলকব্জা নিজে জোড়া লেগে ঘড়ির রূপ ধারণ করতে পারত না।

এইভাবে কলকব্জার কর্তা তার সেই কলকব্জার সঙ্গে আছে। যদি ঘড়ির কলকব্জা-নির্মাতা কলকব্জার সঙ্গে না থাকত, তাহলে কলকব্জা তৈরীই হতো না। এইভাবে যে লোহার দ্বারা কলকব্জা নির্মাণ করা হয়েছে লোহার খনি হতে লৌহ আকরিক নিষ্কাশনকারী এবং গলিয়ে পরিষ্করণকারী, খনি, চুল্লী প্রভৃতি লোহার সঙ্গে যদি না থাকত, তাহলে

খনি হতে লৌহ আকরিক নিষ্কাশন এবং পরিষ্কারণ কার্য হতো না। এ হতে বুঝা যায় যে, ক্রিয়াটি হয়েছিল, সে কর্তাটি সেই ত্রিয়ার সঙ্গে ছিল এইভাবে ময়রা, স্বর্ণকার প্রভৃতি কর্তার ব্যবস্থা জানবে যে, তারা সকলে আপন আপন ক্রিয়ার কর্তা। যিনি যাবতীয় সামগ্রী রচনা করেছেন, সেই শেষ কর্তা তো আর কেউ । সেই সমস্ত সামগ্রী দ্বারাই ময়রা, স্বর্ণকারপ্রভৃতি সকলে আপন আপন ক্রিয়াকে সফল করার সুযোগ পায় এবং দ্রব্যদি নির্মাণ করে।

এবার তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, মানুষ যে জিনিষটি তৈরী করে তাতে কেবল তারই কর্তৃত্ব থাকে না, কিন্তু তাতে থাকে অনেকের কর্তৃত্ব তবেই একটা জিনিষ তৈরী হয়। কেনো এমনটি শুনবে? কেননা, মানুষ অল্প শক্তিমান, সে অনেক কর্তার সহযোগিতা পেয়েই কোনো বস্তু তৈরী করতে পারে। আর সেই সব কর্তা নিজ নিজ ক্রিয়ার সঙ্গেও থাকে। এবার একটু ভেবে দ্যাখো, যখন বড় বড় কাজে তাদের কর্তা সঙ্গে থাকে, তখন স্থুল অপেক্ষা স্থুল এবং সূক্ষ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্ম সৃষ্টি করতে হলে, সেই সমস্ত ক্রিয়ার কর্তা, তাদের সঙ্গে থাকবে না কেনো ? সৃষ্টি তো কেবল সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পাহাড় পর্বত, বৃক্ষ, নদ-নদী, মানুষ, পশু, পাখী প্রভৃতি নয় এছাড়া আরও তো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এমন বস্তু আছে আমরা যার কল্পনাও করতে পারি না, সে সবই সৃষ্টি।

দ্যাখো, পাঁচটি স্থুল ভূত, পাঁচটি সূক্ষ্ম ভূত, আর পঞ্চ তন্মাত্রা অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বহু প্রকার অণু পরমাণু এদের দ্বারাই সৃষ্টি রচিত হয়।

যদি এই সমস্ত বস্তুর সংযোগ কর্তা ওদের সঙ্গে না থাকত, তাহলে কি সমস্ত রূপ পরিগ্রহ করতে পারতো ? জগতের যাবতীয় বস্তু প্রকৃতির পরমাণু দ্বারা সংঘটিত । পরমাত্মা সেই সমস্ত বস্তুর ভিতরে বাইরে বিদ্যমান, তাই তিনি তাদের যুক্ত করে সূক্ষ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং স্থুল অপেক্ষা স্থুল জগৎ রচনা করতে সক্ষম। জগতের যাবতীয় জড় পদার্থের মধ্যে পরমাণু সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম । পরমাত্মা তদপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম এবং এই কারণেই তিনি সকলের মধ্যে ব্যাপক । তিনি যদি ব্যাপক না হতেন, তাহলে সৃষ্টির প্রয়োজনে তাঁকেও অন্য কর্তার ক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করতে হতো যেভাবে জগতের মানুষ এবং প্রাণী সমূহকে অন্যান্য কর্তার ক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়।

এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে পর্যন্ত ক্রিয়ার উত্তরদায়িত্ব থাকে সেই পর্যন্ত প্রত্যেক কর্তা আপন ক্রিয়ায় ব্যাপক থাকে । কেবল প্রশ্ন থেকে যায় যে, হস্ত পদাদি ব্যতীত তিনি কীভাবে বস্তুসমূহকে সংগঠিত করেন ? যদি স্বীকার করা যায় যে, প্রত্যেক পদার্থ হস্ত পদাদি দ্বারাই নির্মিত হয়ে থাকে, তাহলে যে সমস্ত হাত এবং পা, বস্তু নির্মাণে সক্ষম সেই সমস্ত হাত এবং পা কী দিয়ে তৈরি হয়েছে? হাত এবং পা সেও তো সৃষ্ট বস্তু। যদি হাত এবং পা, হাত-পা ব্যতীত তৈরী হতে পারে, তাহলে সৃষ্টির অন্যান্য পদার্থও হাত পা ব্যতীত তৈরী হবে না কেনো? আমি জিজ্ঞাসা করি, মাতৃগর্ভে যে শিশুটি বড় হচ্ছে, তাকে কি হাত দিয়ে গড়া হচ্ছে ? ধরিত্রীর বুকে এই যে নানা প্রকার অঙ্কুর সৃষ্টি হয়ে বৃক্ষের রূপ ধারণ করছে,

বলতো — সে গুলোকে কি হাত পা দিয়ে গড়া হয়েছে ? শুধু তাই নয় ভেবে দ্যাখো, হাত তো কেবল হাতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বস্তু গঠনে সমর্থ, অন্য বস্তু তো তাদের দ্বারা গড়া যাবে না। হাত দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট কীটাণু, মশা, মাছি তথা তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম অংশ কেমন করে গড়া যেতে পারে ? যে পৃথিবীতে মানব প্রভৃতি প্রাণী বাস করে তার পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল। এর চেয়েও লক্ষ কোটিগুণ বড় সূর্য, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহকে হাত দিয়ে কেমন করে গড়বে? এইসব বস্তুকে নিয়মানুসারে গড়তে পারেন একমাত্র সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপক পরমাত্মা। তিনিই সমস্ত বিশ্বজগতকে নিয়মানুসারে পরিচালনা করছেন।

কমলঃ বিমলদা ! তুমি দেখি একটা না একটা নতুন কথা আবিষ্কার করেই ফেলো। নিয়মানুসারে কোন্ কাজটি চলছে বলতো ? আর কোন বস্তুটিই বা নিয়মানুসারে নির্মিত ? আমার চোখের সামনে ঐ যে উঁচু পাহাড়, কোথাও বা গভীর খাদ, কোথাও দ্যাখো — ভয়ানক অরণ্য, কোথাও বা বালুকাময় পৃথিবী, কোথাও আবার ঝোপ-ঝাপ। বলতো এদের কোন্টা ক্রমানুসারে আর কোনটাই বা নিয়মানুসারে সৃষ্টি ? সমস্ত পদার্থ এমনই উঁচু-বন্ধুর-শৃঙ্খলাহীন, এ যেন এক খামখেয়ালীর সংসার। যে কাজ নিয়মানুকূল হয়, সেগুলো একই রকমের হয়। এই যে, মানুষ ঘর বাড়ী তৈরি করে তাতে একটা নিয়ম দেখা যায়। নিয়ম মত বাড়ীর চারদিকে প্রাচীর, উঠান, কুঠুরী, রান্নাঘর, স্নানের ঘর, এসবই থাকে। মালী বাগান করে, তাতে নালা, আইল তৈরী করে, ফুলের টব, তাতে রকমারী গাছ-

পালা নিয়ম মত বসায়। দোকানদার দোকান খোলে তাতে সে সব মালপত্র নিয়ম মত সাজিয়ে রাখে। মানুষের কর্মের মধ্যে নিয়ম দেখা যায়, কিন্তু তুমি এমনি এক উদ্ভট ক্রমবিরুদ্ধ সৃষ্টির কথা বলছ, যে সৃষ্টিতে নিয়ম নেই। সৃষ্টির কোন স্থানে নিয়ম আছে কি ? এ তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি সৃষ্টির সবটাই নিয়মের উল্টো আমার বিবেচনায় সৃষ্টির কোথাও নিয়ম নেই।

বিমলঃ সৃষ্টিতে কোনো নিয়ম নেই, একথা বলা অজ্ঞতার পরিচয়। আচ্ছা বলতো, — সূর্য পূর্ব দিকে উদয় হয় কেনো ? আর পশ্চিমেই বা অস্ত যায় কেনো ? সূর্য কেনো পশ্চিমে উদয় হয় না, এটা বুঝি নিয়মের মধ্যে পড়েনা? মানুষের তৈরী উত্তমোত্তম ঘড়ির সবগুলো কি একইভাবে চলে? কেউ আগে আর কেউ পিছনে চলে না বুঝি? কিন্তু দ্যাখো, পরমাত্মার সৃষ্টি – সূর্যরূপী - ঘড়ি, তার কখনও একদণ্ড, এক পল মাত্রের জন্যও আগা পিছু হয় না। চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির এবং অন্তর্ধানের নিয়ম অটল, এতে কি কোনো সন্দেহ আছে ?

ঠিক্ এই নিয়মের উপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যৎ সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণের দিন ক্ষণ, দণ্ড, পল, সে যত বছর পূর্বেই হোকনা কেনো তা বলে দেওয়া যেতে পারে। ঠিক তেমনি অন্যান্য গ্রহ উপ-গ্রহাদির অবস্থান সম্পর্কে বলা যায়। একটু ভেবেই দ্যাখো, ছোলার দানায় ছোলা হয় কেনো ? তাতে গম হলেই তো পারতো ? আমের আঁটি পুঁতে আমের গাছ হয়, কিন্তু তাতে কমলা লেবু, আপেলের গাছ হয়না কেনো? শিশু জন্ম নিয়ে ধীরে ধীরে

কিশোর, বালক, যুবা, বৃদ্ধ হয় কেনো, এর কারণ বলতে পারো? এরূপ ক্রমের না হয়ে বৃদ্ধ যদি বালক ও কিশোর হতো? চোখ দিয়ে দেখা যায় কেনো ? চোখ দিয়ে শুনলেই তো বেশ হতো। নাক দিয়ে ঘ্রাণ নেওয়া হয় কেনো? আস্বাদের কাজটা নাক দিয়ে নিলেই তো হতো, এদের পিছনে নিয়ম কাজ করছে। বলে তো দিলে — সৃষ্টিতে পাহাড়, কোথাও নদী, কোথাও সমুদ্র, কোথাও উঁচু, তো কোথাও নিচু ঢিপি, কোথাও ঝোপ-ঝাড়, কোথাও ঘন অরণ্য, আবার কোথাও মরুভূমি। সৃষ্টিতে নিয়ম নেই একথা বলা তোমার অজ্ঞানতা ছাড়া আর কী বলবো বলো? তুমি তোমার বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে সৃষ্টিকে মেপে দেখছ।

জগতের নিয়মই এই যে, যে ব্যক্তি যে বস্তুটিকে বুঝতে পারে না, সে সেই বস্তুটির দোষ বর্ণনা করতে থাকে। একটা পিঁপড়ে যখন মানুষের দেহে উঠে ধীরে ধীরে মাথায় চড়ে বসে, তখন সে মাথার চুলে আটকে পড়ে, আর ভাবে এ কেমন দেহ যাতে নিয়মের কোন চিহ্নই নেই, দেহটা তৈরীই হয়েছে অনিয়মের উপর। মাথায় এ কেমন ঝোপ-ঝাড় রে বাবা! সে যখন মাথা হতে নীচে নামতে থাকে তখন কপালের কাছে এসে ভাবে বাঃ ! কেমন সুন্দর পরিষ্কার মাঠ। আর একটু ভ্রূর কাছে নামতেই আবার বিরক্ত। এ দেখি আবার সেই ঝোপ-ঝাড়। এখানে যে কাঁটার মত জাল বিছানো। ভ্রূর সীমা পার হয়ে একটু নীচে এসেই ভাবছে এ আবার কীরে বাবা ! ভ্রূর নীচে এ কেমন গর্ত! চোখের কোন্ বেয়ে নাকের ধারে এসে ভাবছে, এ দেখি আর এক লম্বা পাহাড় খাড়া করে রেখেছে। নাকের নীচে

নেমে দেখে অবাক্, পাহাড়ের মধ্যে আবার সুড়ঙ্গ রচনা করা যে ! নাকের নীচে নেমে দ্যাখে গোঁফ, সেই দেখে আবার চিন্তা ! এখানেও ঘন জঙ্গল করে রেখেছে গোঁফ। পিঁপড়ে তার বুদ্ধি দিয়ে মানব দেহের পরিমাপে ব্যস্ত । সে ভাবে মাপকাঠি অনুসারে মানবদেহটাকে যদি একটা ল্যাপাপোতা পরিষ্কার মাঠ করে দেওয়া হতো, গোঁফ-দাড়ি ও মাথার চুলগুলোকে পরিষ্কার করে, চোখের গোলক—গর্ত বন্ধ করে দেওয়া হতো, নাকটাকে কেটে ন্যাড়া মাথার মত সমতল করে দেওয়া হতো তাহলে মানব দেহ রচনা বোধ হয় নিয়ম পূর্বক হয়েছে বলে মনে হতো। আবার জিজ্ঞাস্য, যদি পিঁপড়ের বুদ্ধির মাপকাঠির মত মানব দেহটা তৈরী করা হতো তাহলে মানুষ কি মানুষ থাকতো ? সে মানব দেহে কি কোনো সৌন্দর্য থাকতো? জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়র নিয়ম পূর্বক ব্যবহার করা তার পক্ষে সম্ভব হতো ? মোটেই না।

আর একটা উদাহরণ দিই শোনো, এক শিল্পী একটি যন্ত্র নির্মাণ করল । সেই যন্ত্রে শত সহস্র যন্ত্রাংশ সন্নিবিষ্ট করা হলো। তার কোনটা লম্বা, কোনটা চওড়া, কোনটা বাঁকা, কোনটা কোনাকুনি,কোনটা গোল, কোনটা খুব লম্বা, কোনটা ছোট । একজন অজ্ঞানী ব্যক্তি সেই যন্ত্রটা দেখে বলছে,— "যন্ত্র নির্মাতা তো দেখি আচ্ছা মূর্খ ! যন্ত্রাংশের কোনটা খুব লম্বা, কোনটা ছোট্ট, কোনটা কত বড়, আবার কোনটা গোল, কোনটা চ্যাপটা এ কেমন যন্ত্র রচনা, যার মধ্যে কোনো সমতা নেই !" বলতো, যে মানুষটি সেই যন্ত্র দেখে সমালোচনা করছে এটা কি তার

বুদ্ধিপূর্বক সমালোচনা করা হচ্ছে ? যন্ত্র নিমার্তা যে যন্ত্রাংশটিকে যে ভাবে তৈরী করা উচিত মনে করেছে, সেটিকে সে সেই ভাবেই তৈরী করছে। সে জানে ঐ ভাবে যন্ত্রাংশ প্রস্তুত করলে তবে যন্ত্রটি চলবে। আর যে প্রয়োজনে যন্ত্রটি নির্মিত, সে উদ্দেশ্যও সিদ্ধি হবে। যদি যন্ত্র নির্মাতা যন্ত্রের সব অংশগুলি একই প্রকারের বা একই ধরণের তৈরী করত, তাহলে কি যন্ত্র চলত ? কখনও না।

ঠিক্ এই অবস্থা পরমাত্মার। তিনি তাঁর সৃষ্টিরূপী যন্ত্রের কোথাও সমুদ্র, তো কোথাও নদ-নদী, কোথা বন-উপবন, তো কোথাও ঝোপ-ঝাড় তৈরী করেছেন, কিন্তু এই সৃষ্টিরূপী যন্ত্রের একটি প্রয়োজনও আছে। সে প্রয়োজনটা কী শুনবে ? জীবের কল্যাণ। অজ্ঞানী মানুষ সৃষ্টিরূপী যন্ত্রটিকে, যন্ত্রাংশগুলোকে, বিশ্রী শৃঙ্খলা ও নিয়মহীন মনে করে। কেননা, জগতের প্রয়োজন বা জগতে সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে কী, তা সে জানেনা। সৃষ্টিরূপী যন্ত্রের যন্ত্রাংশ রূপ সমুদ্র নদী, পাহাড় প্রভৃতি এদের উপযোগিতা সম্বন্ধে তারা অবহিত নয়। তুমি যে মালী ও দোকানদারের উদাহরণ দিয়েছ তাদের নিয়ম অতি ক্ষুদ্র, তাই তুমি তাড়াতাড়ি বুঝতে পারছ। সৃষ্টির নিয়ম বিশাল এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সেই নিয়মের বিশালতা এবং সূক্ষ্মতা তুমি অনুধাবন করতে পারছ না। একটু ভেবে দ্যাখো, যে মস্তিষ্ক দ্বারা জগতের মানুষ নিয়ম সৃষ্টি করছে, সেই মস্তিষ্কটাকেও তো সেই নিয়ামক প্রভুই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তো বিশাল সৃষ্টির অসংখ্য নিয়ম রচনা করেছেন। মনে কর, জগতে যদি নিয়ম না থাকত, তাহলে

পরমাত্মাকে কে মানতো বলো? সৃষ্টির অটল নিয়মই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

কমলঃ আচ্ছা, মানলাম ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছেন?

বিমলঃ মনে রেখো, রচিত পদার্থ কার্য, সেই কাজেই উপাদান কারণ এবং কর্তার প্রয়োজন হয়। ঈশ্বর রচিত পদার্থ নহেন, তিনি অনাদি এবং সনাতন। এক্ষেত্রে প্রশ্নই ওঠে না যে, ঈশ্বরের রচয়িতা কে? যিনি স্বয়ংকর্তা, তাঁর আবার কর্তা কে? যদি কর্তার কর্তা থাকে, তাহলে কর্তার কর্তৃত্ব থাকে না, তখন সে কর্তা কারণে পরিণত হয়ে যায়। কর্তা যে স্বতন্ত্র। যে রচিত পদার্থ, সে কখনও কর্তা হয় না। মানুষ প্রভৃতিকে যে কর্তা বলা হয়, তাদের শরীর কর্তা নয়, শরীর সাধন মাত্র। কর্তা তো আত্মা।

কমলঃ আচ্ছা কর্তার কর্তা না হয় – না হলো, কিন্তু বলতো, ঈশ্বরকে কেনো স্বীকার করা উচিত ? আমরা তাঁর স্তুতি, প্রার্থনা, উপাসনা, এবং তাকে ভক্তি করব কেনো? আমাদের জীবনের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে কীসের?

বিমলঃ এ বিষয়ে আগামী কাল বিবেচনা করা যাবে। কেমন?

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কেনো

(তৃতীয় দিন)

কমলঃ দাদা, আমি এসেছি কালকের প্রশ্নের উত্তর আজ শোনাবে বলেছ, সে কথা মনে আছে তো?

বিমলঃ হ্যাঁ, কাল তুমি প্রশ্ন করেছিলে—"ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করব কেনো? তাঁর স্তুতি প্রার্থনা করে কী লাভ হয় ?"

বেশ, তবে শোনো । জগতের প্রত্যেকটি পদার্থ আপন ভাণ্ডার বা কেন্দ্রের দিকে যেতে চায় । এ নিয়ম জড় এবং চেতন উভয়বিধ পদার্থ সম্বন্ধে প্রযোজ্য । অগ্নি-শিখা সদা ঊর্ধ্বগামী কেননা, অগ্নির ভাণ্ডার সূর্য ঊর্ধ্বে বিদ্যমান। মাটির ঢেলা যত উপরেই ছুঁড়ে ফেল না কেনো, সে সদা আপন ভাণ্ডার পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে । সূর্য কিরণ সমুদ্রের জলকে বাষ্প করে হাওয়ায় মিলিয়ে দেয়, আর সেই বাষ্প মেঘে পরিবর্তিত হয়ে জল রূপে বর্ষিত হয় এবং বহু নদ-নদীর বুক বেয়ে আবার সমুদ্রে ফিরে যায় । অন্যান্য পদার্থ সমূহের অবস্থাও ঐরূপ । জগতে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আছে। জলের ভাণ্ডার সমুদ্র, অগ্নির ভাণ্ডার সূর্য, বায়ুর ভাণ্ডার বায়ুচক্র, মাটির ভাণ্ডার পৃথিবী, ঘটাকাশ, মহাকাশের ভাণ্ডার বৃহদাকাশ। ঠিক তেমনি জগতে একটি জ্ঞানের ভাণ্ডার আছে, সেই ভাণ্ডারটি

পরমাত্মা। মানুষ যে জ্ঞান লাভ করে থাকে, সেই জ্ঞানের উৎসই পরমাত্মা। কোনো মানুষকে না পড়ালে সে জ্ঞান লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। মানুষ যদি না পড়ে জ্ঞান লাভ করতে পারত, তাহলে বিদ্যালয়, কলেজ, পাঠশালার কোনো প্রয়োজনই থাকতো না। শুধু তাই নয়, শিক্ষকদেরও প্রয়োজন থাকত না। বাল্যকালে মাতা পিতা ছেলেদের প্রথম প্রথম বলতে শিক্ষা দেয়, এবং পদার্থ সমূহের জ্ঞান করায়। এটা পয়সা, এটা টাকা, এটা ঘটি, এটা জল, এ তোমার কাকা, এ তোমার ভাই, এরকম হাজার হাজার শব্দ মুখস্থ করায়—আর বলায়। তারপর সেই ছেলেই পাঠশালায় গিয়ে গুরুর কাছে বিবিধ প্রকারের জাগতিক জ্ঞান লাভ করে। মাতা, পিতা তথা গুরুর কাছে ঐ কথা শিক্ষা করে। এইভাবে প্রত্যেক মানুষ একজন অপরজনের কাছে জ্ঞান লাভ করে থাকে।

প্রশ্ন এই যে, মানুষ যদি একজন অপর জনের কাছে জ্ঞান লাভ করেই থাকে, তাহলে সৃষ্টির আদিতে মানুষ কোন মাতা-পিতা বা গুরুর নিকট জ্ঞান লাভ করেছিল? যদি প্রশ্ন করা হয়, পরমেশ্বর কেমন করে সকলকে জ্ঞান দিলেন, পরমেশ্বর কেমন করে মানুষদের পড়ালেন? কেনো না, তাঁর তো কোনো ইন্দ্রিয় নেই। এর উত্তরে বলব জ্ঞান দান এবং পড়ান এ দুটোয় পার্থক্য আছে। শব্দ দ্বারা পড়ান যায় আর জ্ঞান দান করা যায় আত্মায়। পরমাত্মা সর্বত্র ব্যাপক, তিনি যে সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছেন, সেই সমস্ত বস্তু, জীব এবং মানুষের মধ্যেও ব্যাপক। অতএব তিনি স্বীয়

জ্ঞানময়ী শক্তি দ্বারা চার ঋষির আত্মায় জ্ঞানের প্রকাশ করে থাকেন। তাঁদের আমরা অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা বলে থাকি। ঋষিগণই শব্দের মাধ্যমে সংসারের অপরাপর মানুষকে আবার পড়ানো আরম্ভ করেন। এইভাবে পঠন এবং পাঠনের ক্রম প্রচলিত হয়েছে যদি পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভকালে ঋষিদের অন্তরে জ্ঞান না দিতেন, তাহলে পঠন-পাঠনের ক্রম চলত না। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যে সমস্ত জ্ঞান লাভ করেছে তা পরম্পরা ক্রমেই করেছে, এবং সেই ভাবেই তাদের জ্ঞানের বিকাশ হয়েছে, তারা পরমাত্মাপ্রদত্ত বুদ্ধিবলে পরমাত্মার সৃষ্টি রচনাকে দেখেই জ্ঞান লাভ করেছে। মানুষ জ্ঞানের বিকাশ করতে পারে সত্য, কিন্তু কেউ জ্ঞান না দিলে সে জ্ঞান লাভ করতে পারে না। সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমাত্মা ঋষিদের হৃদয়ে বীজাকারে জ্ঞান দান করেন। তারপর সেই জ্ঞান ঋষি এবং বুদ্ধিমান মানুষের দ্বারা বৃক্ষরূপ হয়ে বিস্তার লাভ করেছে। এই নিয়মই সদা চলে আসছে এবং চলতে থাকবে।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, সংসারের প্রত্যেকটি পদার্থ আপন ভান্ডারের দিকে যেতে চায় এবং যায়। সে অবস্থায় আপন চেতন জীবাত্মা অর্থাৎ আপ্ত জ্ঞানবান ব্যক্তি জ্ঞানের ভাণ্ডার পরমাত্মার দিকে কেনো যেতে চাইবে না? জীবাত্মাও পরমাত্মায় থেকে যেতে চায় কেননা, তার বিকাশ অর্থাৎ উন্নতি পরমাত্মা ছাড়া হতে পারে না। জড়ের বিকাশ জড়ের সাহায্যে এবং চেতনের বিকাশ চেতনার সাহায্যেই হয়ে থাকে। জগতের কোনো জড় পদার্থ দ্বারা চেতন জীবাত্মার উন্নতি হতেই পারে না। হ্যাঁ,

জড় পদার্থের দ্বারা জড় শরীরের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, যদি অবশ্য সে তার উপযোগ জ্ঞানপূর্বক করে । জীবাত্মা অজ্ঞানতাবশতঃ জগতের পদার্থ সমূহে উন্নতির সন্ধান করে, পরন্তু তাদের উন্নতি হয় না । তাই তাদের মনে শান্তি নেই। জগতে যত দুঃখ, সে সমস্তই অজ্ঞতাজনিত । জীবাত্মা যদি পদার্থের বাস্তবিকতা সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহলে সে কখনও দুঃখ ভোগ করবে না। জীবাত্মার উপর দুঃখ এবং বন্ধনের আবরণ তত সময় থাকে, যত সময় সে অবিদ্যাকে বিদ্যা, অসত্যকে সত্য এবং জড়কে চেতন বলে মনে করে।

জ্ঞানের ভাণ্ডার পরমাত্মা, তিনিই সর্বসুখের ভাণ্ডার । এছাড়া জগতের কোনো পদার্থে সুখের লেশ মাত্র নেই। যদি জাগতিক পদার্থে সুখ থাকত, তাহলে, বিশ্বজগৎ সুখী হতো । কিন্তু ব্যাপার এই যে, জগতের প্রত্যেকটি প্রাণী সুখ কামনা করে যখন সে সুখ কামনা করে, তখন দেখা যায়, তার কাছে সুখ নেই। যদি থাকত, তাহলে সে সুখের কামনা করত কেনো ? তাই বলছিলাম ঈশ্বরের স্তুতি, ঈশ্বরের ভক্তি, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করার অর্থ এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে মানুষের প্রেম হোক্। কেননা মানব জীবনের উদ্দেশ্যই হল পরমাত্মার প্রতি মানুষের প্রেম জাগ্রত করা মানুষ পরমাত্মার স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা যত শুদ্ধ পবিত্র মনে করবে, সে ততই ঈশ্বরের সমীপস্থ হবে এবং অবশেষে সে জগতের সমস্ত দুঃখ এবং বন্ধনের হাত হতে নিষ্কৃতি লাভ করে পরমানন্দ লাভ করবে ।

কমলঃ তুমি বলতে চাচ্ছো জাগতিক পদার্থে কোন সুখ নেই ?

বিমলঃ ভাইটি শোনো। বাস্তবিক পক্ষে জাগতিক পদার্থে সুখ নেই । যেটাকে সুখ বলে মনে করা হয় সেটা সুখাভাস অর্থাৎ সুখের মত মনে হয় । সুখ? সে তো প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই রয়েছে । মানুষ যখন জাগতিক কোনো বস্তুর ব্যবহার আরম্ভ করে এবং তাতে সে সুখানুভব করতে থাকে, তখন সে মনে করে, এই পদার্থ হতেই সে সুখ পাচ্ছে। বাস্তবিক পক্ষে সে সেই পদার্থ হতে সুখ পাচ্ছে না! তারই চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা তারই মধ্যে সুখানুভব হচ্ছে । কুকুর যখন হাড় চিবোতে থাকে, যখন তাঁর দাঁতের মাড়ি ফেটে যায়, আর—তা হতে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। যতই রক্তক্ষরণ হতে থাকে, ততই সে আরও জোরে হাড় চিবোতে থাকে । সে মনে করে ঐ হাড়ের টুকরো হতেই রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে রক্তক্ষরণ হাড়ের টুকরো হতে হচ্ছে না, হচ্ছে তার মাড়ি থেকে। হাড়ে রক্ত কোথায় ?

ঠিক্ এইভাবে জেনে রাখো জাগতিক পদার্থে সুখ নেই, সুখ নিজের মধ্যে আছে সে অনুভূতি প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে থাকে । দ্যাখো, যদি ধনে সুখ থাকত, তাহলে কোনো ধনীকে দুঃখ ভোগ করতে দেখা যেতো না । তারা সদাই সুখ ভোগ করতো । যত দুঃখ এবং ভয় ধনবানদের মধ্যে দেখা যায়, তত দরিদ্রদের মধ্যে দেখা যায় না। একজন ধনবান, সে যখন রোগে কষ্ট পায়, তখন সে ধন দিয়ে ঔষধ-পত্র ক্রয় করে, কিন্তু সে স্বাস্থ্য ক্রয় করতে পারে কি? ধনবান্ যদি মূর্খ হয়, বই কিনতে পারবে, শিক্ষক,

পণ্ডিত রাখতে পারবে, কিন্তু সে ধন দিয়ে বিদ্যা কিনতে পারবে না। বিদ্যা যে পরিশ্রমলব্ধ বস্তু। এইভাবে ধন দিয়ে ভোজন কেনা যেতে পারে, কিন্তু ক্ষুধা কেনা যাবে না। জগতে এমন মানুষও আছে যার শত নয়, লক্ষ নয়, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি আছে, কিন্তু সে আধ পোয়া চালের ভাত বা আধ পোয়া দুধ হজম করতে অক্ষম। এবার বলতো ধনে সুখ কোথায়? যদি বলি ভোজনে সুখ আছে। বেশ। একজন চারখানা রুটি খেয়ে যে আনন্দ পাবে, সে অবশ্যই ষোলখানা রুটি খেয়ে তার চতুর্গুণ সুখ পাবে। কেননা, সুখ লাভ করান যদি রুটির ধর্ম হয়, তাহলে রুটির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুখের মাত্রাও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কিন্তু তা হয় কী ? ক্ষুধার সময় যদি অধিক রুটি খাওয়া যায়, তাহলে পেটে বেদনা হওয়া আরম্ভ করবে, ডাক্তার বৈদ্য ডেকে আনার প্রয়োজন হবে। ক্ষুধার সময় শুকনো রুটিও অমৃতের সমান মনে হবে।

আর যদি ক্ষুধা না থাকে, তাহলে অমৃতও স্বাদহীন হবে। এইভাবে কাপড় চোপড়ের কথাও জানবে। যদি মনে করা যায় যে, কাপড়-চোপড়ে সুখ আছে, তাহলে শীতের দিনে গরম কাপড়, তুলোর মোটা মোটা জামা-যা পরলে খুবই সুখ হয়, গরমের দিনে সেইসব কাপড়-চোপড়ও সুখকর হওয়া উচিত। যদি বস্ত্রের ধর্ম সুখদান করা হয়, তাহলে সকল সময় তা দ্বারা সুখ পাওয়া উচিত। এমন কী কারণ যে, গ্রীষ্মকালের উপযুক্ত বস্ত্রাদি শীতকালে এবং শীতকালের উপযুক্ত বস্ত্রাদি গ্রীষ্মকালে সুখকর হয় না ? যেটি যার ধর্ম, সকল সময় তার একই রূপ থাকা উচিত যেমন – অগ্নি,

অগ্নির ধর্ম দহন করা, অগ্নিকে তুমি যখনই স্পর্শ কর না কেনো, সে তখনই তোমায় দহন করবেই। মিষ্টির ধর্ম মিষ্টতা, তাকে যে কোনো সময় খাওনা কেনো, মিষ্টি লাগবেই। ঠিক্ তেমনি, যদি জাগতিক পদার্থের ধর্ম সুখকর হয়, তাহলে জাগতিক পদার্থ পাওয়া মাত্রই মানুষ সুখী হবে সে অবস্থায় মানুষ সুখের সন্ধানে ছুটে বেড়াবে না। জাগতিক পদার্থ পেয়ে প্রত্যেক মানুষের সুখানুভব হওয়া উচিত। আচ্ছা বলতো দেখি, একটা মানুষ যার ১০৫ ডিগ্রি জ্বর, তাকে সুন্দর রেশমী বস্ত্র পরিয়ে, সুখদায়ক সোনার পালঙ্কে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় যদি শুইয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কি তাকে সুখ স্পর্শ করবে? কখনই নয়। তাই তো বলছিলাম জাগতিক পদার্থে সুখ নেই, সুখের ভাণ্ডার ঈশ্বর! কেবল তাতেই সুখ। সুখ আর কোথাও নেই।

কমলঃ বুঝলাম। আচ্ছা যদি জাগতিক পদার্থ সমূহে বাস্তবিক পক্ষেই সুখ না থাকে, সুখ যদি নিজের মধ্যে থাকে, তাহলে, মন্ডা, নাড়ু বা জিলিপি খেয়ে আনন্দ হয়, কিন্তু মাটি খেলে আনন্দ হয় না কেনো ? রুটি খেলে আনন্দ হয়, কিন্তু পাথর চিবোলে আনন্দ হয় না কেনো? মিছরী খেলে আনন্দ হয়,কিন্তু ঘাস-পাতা খেলে আনন্দ হয় না কেনো? কোনো সুন্দর দৃশ্য দেখলে আনন্দ হয়, কিন্তু শ্মশান দেখলে আনন্দ হয় না কেনো? এর কারণ কী ?

বিমলঃ শোনো সন্দেশ, জিলিপি, মিছরী প্রভৃতি যত খাদ্য পদার্থ আছে তা খেলে তাদের গুণের বোধ হয় কিন্তু আনন্দের বোধ হয় না, যেমন

মিছরী। মিছরী খেলে মিষ্টি বোধ হলো, আর লঙ্কা খেলে, ঝাল । এবার একটু ভেবে দ্যাখো, ঝালের নাম আনন্দ নয়, মিষ্টির নামও আনন্দ নয় । যে বস্তুতে মানুষের চিত্তের তন্ময়তা এসেছে, সে তাতেই আনন্দ অনুভব করে । ঠিক্ তেমনি, যার লঙ্কা খাওয়ার অভ্যাস নেই, তারপক্ষে লঙ্কা বিষের মত মনে হবে। এইরূপ অবস্থা অন্যান্য জাগতিক পদার্থ সম্বন্ধেও বলা চলে। বাকী রইল মাটি খেলে আনন্দ হয় না কেনো? মাটি খেলেও আনন্দ হয় যদি তাতে তার তন্ময়তা জন্মে। আমি অনেক ছোট ভাই-বোনদের কাঁচা মাটি, মাটির খুরি এবং মোলায়েম মাটি খেতে দেখেছি। এমন অনেক জীবকে দেখেছি যারা কাঁকর-পাথর খায় । কাঁকর-পাথর খাওয়ার কথা থাক্ মদের মত দুর্গন্ধযুক্ত, ঝাল-ঝাল, কষা-কষা দ্রব্য এবং তেতো আফিম খেয়েও তো মানুষ আনন্দ পায়। বাস্তবিক পক্ষে বলতো ঐ সব বস্তুতে কি আনন্দ জড়িয়ে আছে? নেই । আনন্দ, যা সে অনুভব করে, সেটা তার চিত্তের তন্ময়তা মাত্র। যত সময় চিত্তে তন্ময়তা থাকে, তত সময় আনন্দও থাকে । প্রশ্ন হতে পারে যে, বস্তু বিশেষে চিত্তের তন্ময়তা কেমন করে উৎপন্ন হয়?

উত্তর এই যে, মানুষ যখন কোনো কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন তার মধ্যে সেই বস্তুর প্রতি তন্ময়তা জন্মে। কেননা, অভ্যাস করতে করতে মনের উপর সেই বস্তুর সংস্কার পড়ে এবং সেই সংস্কার বারবার সেই বস্তুটি ব্যবহার করার জন্য ভিতর হতে প্রেরণা পেতে থাকে। এইরূপ একই কথা কোনো সুন্দর দৃশ্য দেখা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। মানুষ আপন

মনকে প্রসন্ন করার জন্য নদী, সমুদ্র, বন-উপবন তথা পার্বত্য প্রদেশ দর্শন করার জন্য যায় । কিন্তু, যখন কেউ তার বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর মামলা মোকদ্দমা করে, তখন কোনো স্থানেই সে আনন্দ পায় না, সর্বত্র তার শ্মশান বলে মনে হয় । কেননা, মোকদ্দমা তার মনে অন্য কোনো বিষয় বস্তুর প্রতি তন্ময়তা উৎপন্ন হতে দেয় না।

একজন সিনেমায় যায়— সুন্দর দৃশ্য, সঙ্গীত, গীত-বাদ্যের আনন্দ উপভোগ করার জন্য । যে সময় তার সন্মুখে সুন্দর দৃশ্য ভাসছে, সে সময় যদি তার স্নেহের ছেলেটি বাড়ীতে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকার সংবাদ পায়, তখন কি সে সিনেমা দেখে আনন্দ পাবে? পাবে না । কেনো পাবে না, জানো? স্নেহের ছেলেটি বিছানায় অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, না জানি তার অবস্থা কী রকম আছে ! এইসব চিন্তা, ভাবনা সুন্দর দৃশ্যে তন্ময়তা আসতে দেয় না। আর এক কথা ভেবে দ্যাখো,—মনে কর আমি তোমায় এখন বেশ ভাল সন্দেশ খেতে দিলাম, আর তুমি তা খেতে লাগলে । কিন্তু খাওয়ার সময় আমি যদি অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি তোমার মন আকৃষ্ট করি, তাহলে তোমার মুখে সন্দেশ গেলেও সন্দেশের আস্বাদ পাবে না । এমনও হয়ে থাকে যে, মানুষ খেয়েই চলেছে, আর তার মন অন্যও কোনো বিষয়ে আছে । সেই অবস্থায় খাদ্য বস্তুর গুণাগুণ সে বুঝতে পারবে না । অতএব প্রমাণিত হলো যে, বাহ্য বস্তুতে সুখ বা আনন্দ নেই । সুখ ও আনন্দ আছে কেবল চিত্তের তন্ময়তায় ।

কমলঃ তুমি তো বলেছিলে যে, পরমাত্মা সুখের ভাণ্ডার, আবার এখন বলছ সুখ ও আনন্দ আছে চিত্তের তন্ময়তায় - এই দু'রকম কেনো বলছ?

বিমলঃ চিত্তের তন্ময়তা এবং একাগ্রতা দ্বারাই সুখ স্বরূপ পরমাত্মার অনুভূতি লাভ করা যায় - তাতেই সুখ লাভ হয় । কেবল অজ্ঞানী মনে করে যে, সুখ বাহ্য বস্তু হতে সে লাভ করছে। এতে দ্বিমত নেই, কথা একই । কিন্তু বুঝতে গেলে একটু গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে, তলিয়ে দেখতে হবে । জগতের পদার্থসমূহে অভ্যাসের কারণে ক্ষণিক একাগ্রতা উৎপন্ন হয় । তাই তাতে ক্ষণিক সুখ লাভ হয়। যদি পরিপূর্ণরূপে পরমাত্মার ভক্তিতে মনকে একাগ্র করার অভ্যাস করা যায়, তাহলে মানব জীবনের যে পরম লক্ষ্য পরমাত্মা লাভ, অবশেষে তাঁকে লাভ করা যেতে পারে । এই কারণেই ঈশ্বরের প্রতি চিত্তকে যত অধিক একাগ্র করবে ততই আনন্দ পাওয়া যবে ।

কমলঃ এর কী প্রমাণ আছে যে, যার চিত্ত যত অধিক একাগ্র হবে সে ততোধিক আনন্দ লাভ করবে?

বিমলঃ হ্যাঁ, এর প্রমাণ আছে। এর প্রমাণ তোমার জাগ্রত এবং সুষুপ্তির অবস্থা দিয়েই বুঝিয়ে দিচ্ছি । শোনো । মানুষ যখন জাগ্রত থাকে, তখন মানুষের বৃত্তি সমূহ জাগতিক পদার্থের দিকে ছড়িয়ে থাকে । মন কখনো এক পদার্থে যুক্ত থাকে না, সে একবার এতে, একবার ওতে, একবার

তাতে ছুটে বেড়ায়। এই কারণেই মনে স্থিরতা এবং একাগ্রতা জন্মায় না। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় যখন তার মনের বৃত্তি সমূহ নিতান্ত একাগ্র হয়, সে সময় সে আনন্দ অনুভব করে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই বলে—"আমি খুব আরামে ঘুমিয়েছি, খুব ঘুম ধরেছিল।" সে ঘুমিয়ে যে আনন্দ লাভ করেছে, সে আনন্দ লাভ চিত্তের একাগ্রতার জন্য কেননা, প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হওয়ায় পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হয়। জীবাত্মার সম্বন্ধ, হয় পরমাত্মার সঙ্গে থাকবে, না হয়, প্রকৃতির সঙ্গে থাকবে। জীবাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠতর হবে জীবাত্মার দুঃখও ততোধিক বৃদ্ধি পাবে। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যত অধিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হবে, ততই তার সুখ বৃদ্ধি হতে থাকবে।

একটা মানুষ জেলে পড়ে আছে তার জ্বর হয়েছে, পেটে একটা ফোঁড়াও হয়েছে, লক্ষলক্ষ টাকা ধার নিয়েছে, ঘরে আগুন লেগেছে, স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুও হয়েছে। মোট কথা সে অনেক দুঃখ ভাবনায় পড়ে আছে। এই দুঃখ-কষ্ট কত সময় থাকবে? যত সময় সে জাগ্রত অবস্থায় থাকবে তত সময় থাকবে! কিন্তু যদি সে কোনো প্রকার ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে তার সমস্ত দুঃখ, চিন্তা-ভাবনা দূরে সরে যাবে। সে সময় এক রাজা যে আনন্দ অনুভব করে সে সেই আনন্দ অনুভব করবে। কেবল মানুষই নয়, প্রত্যেক প্রাণীই সুষুপ্তি অবস্থায় আনন্দ অনুভব করে থাকে। চিত্তের বৃত্তি সমূহের একাগ্রতার নামই 'যোগ' অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে মিলন। সুষুপ্তি অবস্থাতে বিনা জ্ঞানেই ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার মিলন হয়। কিন্তু স্তুতি, প্রার্থনা এবং

উপাসনা দ্বারা যখন জ্ঞান পূর্বক পরমাত্মার সহিত মিলন ঘটে, সেই মিলনকে বলা হয় জীবাত্মার আত্মিক উন্নতি। আর এই আত্মিক উন্নতি জীবের উদ্দেশ্যকে সমাধি দ্বারা পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে পরমাত্মায় তন্ময় করিয়ে দেয়।

কমলঃ স্তুতি, প্রার্থনা, উপাসনা কাকে বলে?

বিমলঃ শ্রদ্ধাপূর্বক ঈশ্বরের গুণ বর্ণনা করা 'স্তুতি', সেই গুণ সমূহ দ্বারা আপন দোষগুলিকে সংশোধন করার জন্য ঈশ্বরের নিকট সহায়তা যাচনার নাম 'প্রার্থনা' এবং জাগতিক বস্তু সমূহ হতে অহংকারের ভাব দূরে সরিয়ে এনে আমার সমীপে পরমাত্মা এবং আমি পরমাত্মার সমীপে এরূপ দৃঢ় ধারণা সৃষ্টির নাম 'উপাসনা'।

কমলঃ দাদা ! তুমি ঈশ্বরকে শরীর-রহিত বলে স্বীকার কর। কিন্তু সংসারের বহু লোক যে, ঈশ্বরকে শরীর-ধারী বলে স্বীকার করে এবং পূজাও করে। আমার জিজ্ঞাসা, ঈশ্বরকে যদি শরীরধারী অথবা সাকার স্বীকার করা হয়, তাতে দোষ কী?

বিমলঃ এর উত্তর আগামীকাল দেব।

ঈশ্বর সাকার নয় কেনো?

(চতুর্থ দিন)

কমলঃ দাদা! গতকাল যে প্রশ্ন করেছিলাম তার উত্তর দাও।

বিমলঃ তোমার গতকালকার প্রশ্ন "ঈশ্বরকে যদি সাকার স্বীকার করা হয়, তাতে দোষ কী?" এই তো? আচ্ছা, তবে শোনো।

ঈশ্বরকে সাকার স্বীকার করলে একটা নয় — অনেক দোষ। ভেবে দ্যাখো, ঈশ্বরের লক্ষণ – তিনি সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ শব্দে তিনটি পদ আছে । সৎ-চিৎ-আনন্দ । সৎ অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান। তিনকালেই যে একরস হয়ে বিদ্যমান থাকে। আর এক কথায় বলা হয়, যাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়, তাকে বলা হয় 'সৎ'। যে জ্ঞান যুক্ত সে 'চিৎ', আর ত্রিকালে যাতে দুঃখের অত্যন্ত অভাব সে 'আনন্দ' । ঈশ্বর এই কারণেই সচ্চিদানন্দ যেহেতু ঈশ্বরে কখনও পরিবর্তন হয় না, তাঁর জ্ঞান কখনও নষ্ট হয় না, আর তাতে কখনও দুঃখ ব্যাপ্ত হয় না। জগতে যত সাকার পদার্থ দৃষ্ট হয় সেই সমস্ত পদার্থে পরিবর্তন দেখা যায়, তাই তারা 'সৎ' নয়। 'চিৎ' কেবল নিরাকার আত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েই পাওয়া যায়। কোনো সাকার বা দেহধারী দুঃখের

হাত হতে রক্ষা পেতে পারে না, ত্রিকালে তাতে 'আনন্দ'ও থাকতে পারে না।

■ প্রথম দোষ — শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, রোগ শোক, বৃদ্ধত্ব, মৃত্যু প্রভৃতি প্রত্যেক সাকার বা দেহধারীকে গ্রাস করে দুঃখ দেয়। ঈশ্বর সর্বদা এই সমস্ত হতে পৃথক্ । অতএব ঈশ্বরকে সাকার স্বীকার করলে তাঁকে দোষ স্পর্শ করবে, সে অবস্থায় ঈশ্বর 'সচ্চিদানন্দ' এবং নির্বিকার হতে পারবেন না। কেননা, প্রত্যেক সাকার পদার্থে জন্ম, বৃদ্ধি, ভয়, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি বিকার দোষ থাকে।

■ দ্বিতীয় দোষ — ঈশ্বরকে সাকার স্বীকার করলে তিনি 'সর্বব্যাপক' হতে পারবেন না কেননা, প্রত্যেক সাকার পদার্থ একদেশী অর্থাৎ একস্থানে স্থিতিশীল।

■ তৃতীয় দোষ — ঈশ্বর 'অনাদি' ও 'অনন্ত' হতে পারবেন না। কেননা, প্রত্যেক 'সাকার' বা 'অবয়বী' বা 'দেহধারী' উৎপন্ন হয়ে থাকে। যে বস্তুর আরম্ভ আছে অর্থাৎ সে সাদি। এ অবস্থায় ঈশ্বরে অনাদিত্ব গুণের অভাব হবে। ঈশ্বর অনাদি হতে পারবেন না, অনন্তও হতে পারবেন না। যার আদি আছে, তার অন্তও অবশ্যই আছে। যার উৎপত্তি আছে, তার বিনাশও আছে। যে নদীর এক পাড় থাকে তার অপর পাড়ও থাকে।

■ চতুর্থ দোষ — ঈশ্বরে সর্বজ্ঞত্ব গুণের অভাব হবে। কেননা, যদি ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ স্বীকার করা যায়, তাহলে ঈশ্বর সাকার হওয়ায় এক দেশে অবস্থিতির কারণে তার পক্ষে সর্বত্র বিদ্যমান থাকা সম্ভব হবে না। যদি ঈশ্বর সর্বত্র না থাকেন তাহলে তাঁর মধ্যে সব স্থানের জ্ঞান থাকাও সম্ভব হবে না, তার জ্ঞান এক স্থানেরই হবে। ঈশ্বর যে দেশে বা যে স্থানে থাকবেন তাঁর সেই দেশের বা সেই স্থানের জ্ঞানই হবে। পরিণাম — ঈশ্বর অন্তর্যামীও হতে পারবেন না। কেননা, তিনি প্রত্যেকের মনের কথা জানতে পারবেন না।

■ পঞ্চম দোষ — ঈশ্বরে নিত্যত্ব গুণের অভাব হবে ঈশ্বর অনিত্য হয়ে যাবেন। সেইই নিত্য, যার অস্তিত্ব থাকবে, অথচ তার কোনো কারণ থাকবে না। সে কোনো পদার্থের সংযোগ দ্বারা উৎপন্নও হবে না। কেননা, যে সাকার, সে বস্তু-তত্ত্বের মিশ্রণে বা যোগে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

■ ষষ্ঠ দোষ — পরমাত্মা সর্বাধার গুণ রহিত হবেন। তিনি সর্বাধার না হয়ে অপরাধার হয়ে যাবেন। পরমাত্মা সর্বাধার কেনো জানো? কেননা, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই আশ্রয়ে থেকে গতিশীল, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি ধারণ করে আছেন। যদি পরমাত্মাকে সাকার স্বীকার করা যায়, তাহলে তিনি কারো আশ্রয়ে থাকবেন। এই কারণেই তো মত মতান্তরবাদীর দল ঈশ্বরকে সাকার করে, তাঁর আশ্রয়স্থল তৈরী করে রেখেছে। কেহ সপ্তলোক, কেহ চতুর্থ লোক, কেহ বা ক্ষীর সাগর, কেহ বা গোলক, কেহ

আবার বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি স্থান স্থির করে রেখেছে। যদি পরমেশ্বর নিজেই অপরের আশ্রিত হয়ে থাকেন তাহলে বলতো জগৎটা থাকবে কার আশ্রয়ে ? জগৎ তখন যে নিরাশ্রয় হয়ে যাবে। ঈশ্বরকে সাকার স্বীকার করলে এমনি আরও অনেক দোষ ঈশ্বরে যুক্ত হবে।

কমলঃ বিদ্বান্ ব্যক্তিদের অভিমত, ঈশ্বর নিরাকার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ! কিন্তু কথা কী জানো, দাদা ! ঈশ্বর সময় সময় সাকার রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। যদি বল সে কী করে হয়? আমি বলব এমন করে হয়। যেমন নাকি,—বাষ্প নিরাকার। কিন্তু সেই বাষ্প কখনও কখনও জমাট বেঁধে মেঘাকারে, কখনও বরফের আকারে মূর্তিমান হয়ে ফুটে ওঠে। অগ্নি সর্বব্যাপক নিরাকার, কিন্তু সময় সময় স্থুল রূপে দেখা দেয়। এমনি আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। জগতের ভৌতিক পদার্থ যদি নিরাকার থেকে সাকার হতে পারে, তা হলে নিরাকার ঈশ্বরই বা সাকার হতে পারবেন না কেনো ?

বিমলঃ বাষ্প এবং অগ্নির উদাহরণ তুমি দিলে বটে, কিন্তু সেগুলো ঠিক্ বলে মনে হয় না। একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দ্যাখো। 'বাষ্প' এবং 'অগ্নি' এরা একক পদার্থ নয়। এরা অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। জলের অসংখ্য ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পরমাণু বাষ্পের আকার ধারণ করে এবং সেই পরমাণুর সমষ্টিই আবার যখন স্থুল হয়ে মেঘরূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাকে আমরা বলি 'জল', 'বরফ'। বাষ্প যদি একটি মাত্র পরমাণু এবং এক রস হতো, তাহলে সে কোনো কালেও স্থুল হতে পারত না। অগ্নির পরমাণু

সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। অগ্নির পরমাণুও অসংখ্য হওয়ায় পরস্পর সংযোগে স্থুল রূপে প্রচণ্ড অগ্নির আকার ধারণ করে। অগ্নি সর্বব্যাপক এবং নিরাকার একথা বলা ভয়ঙ্কর ভুল। 'অগ্নি' পৃথিবী এবং জল অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাই তাকে পৃথিবীতে এবং জলে ব্যাপক স্বীকার করা যেতে পারে, কিন্তু-আকাশ এবং বায়ুতে স্বীকার যায় না। তবে হ্যাঁ, আকাশ এবং বায়ু এ দুটোই অগ্নিতে ব্যাপক। কেননা, এ দুটোই অগ্নি অপেক্ষা সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম পদার্থই স্থুল পদার্থে ব্যাপক হয়ে থাকে। যে সব পদার্থে অগ্নি ব্যাপক রূপে আছে, সেই পদার্থ সমূহ সাকার বা রূপ যুক্ত। জগতে যাহা রূপবান দৃষ্ট হয়, সে সমস্ত অগ্নির ব্যাপকর্তার কারণে। কেননা, রূপ অগ্নির একটি গুণ। অতএব প্রমাণিত হলো যে, ভৌতিক পদার্থের সমষ্টি সূক্ষ্ম অপেক্ষা স্থুল, এবং সে সূক্ষ্ম অপেক্ষা এই জন্য স্থুল, যেহেতু সে বহু পরমাণুর সমষ্টি দ্বারা গঠিত। পরমাত্মা সর্বব্যাপক, এক এবং একরসযুক্ত। অতএব তিনি নিরাকার থেকে সাকার হতে পারেন না।

প্রশ্ন রইল, ঈশ্বর সময় সময় অবতার গ্রহণ করে থাকেন। এরূপ ধারণা ডাহা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। দ্যাখো, অবতার শব্দের অর্থ হলো 'অবতরণ করা' বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নামা। উপরে উঠা বা নামার ব্যবহার একদেশিতার লক্ষণ অর্থাৎ উঠা-নামা ক্রিয়া একস্থানে অবস্থানকারী বস্তুর পক্ষেই সম্ভব। যে 'সর্বব্যাপক' তাঁর পক্ষে অসম্ভব। যে সর্বব্যাপক তাঁর পক্ষে আসা যাওয়া, উঠা-নামা করা সম্ভব হতে পারে

না। যিনি সব স্থানে থাকেন তিনি আবার আসবেন কোথা হতে, আর যাবেনই বা কোথায়?

কমলঃ তাহলে তুমি বলতে চাও যে, রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দুষ্টদের বিনাশ করার জন্য ঈশ্বর অবতার রূপে আসেননি ? শুধু তাই নয়, তোমার মতে ভবিষ্যতে দুষ্টের বিনাশ সাধনের জন্য ঈশ্বরের অবতার হবেও না। আমি তো শুনেছি, যখন যখন ধর্মের হানি ও গ্লানি হয়, তখন তখন ঈশ্বর অবতার রূপে ধরায় অবতীর্ণ হন।

বিমলঃ ঈশ্বরের অবতার কখনও হয়নি, কখনও হবেও না। সময় সময় যে সব মহাপুরুষ জন্ম নিয়েছিলেন, যাঁরা দুষ্টের দমন করেছিলেন অথবা জনসাধারণকে সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন, জনসাধারণ তাঁদের নানাপ্রকার উপাধি দিয়েছে। সেই মহান্ পুরুষদের নাম কেউ 'পয়গম্বর' রেখেছে—কেউ তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলেছে। কেউ তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে স্বীকার করেছে। কেউ তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলেছে। মনে রাখতে হবে, তাঁরা কিন্তু সকলেই মানুষ ছিলেন। একটু বিচার বিবেচনা করেই দ্যাখো। যিনি অশরীরী হয়ে শরীর-ধারী প্রাণীকুলকে সৃষ্টি করতে পারেন, সেই ঈশ্বর কি অশরীরী হয়ে শরীর ধারী প্রাণীদের সংহার করতে পারেন না? জগতে আজও অসংখ্য প্রাণী জন্ম নিচ্ছে, এবং মরছে। ঈশ্বর কি শরীর ধারণ করে তাদের সৃষ্টি ও সংহার করছেন? সামান্য মাত্র ভূকম্পনে লক্ষলক্ষ প্রাণীকে মরতে দেখেছ। এক ঘূর্ণি ঝড়ের আঘাতে কত নগর বিধ্বস্ত হয়ে যায়, প্লেগ মহামারীতে, কলেরায়, শত শত,

লক্ষলক্ষ মানুষ মরে যায়, আর সামান্য মাত্র একজন তুচ্ছ প্রাণীকে মারার জন্য কিনা ঈশ্বরকে অবতার হতে হবে? তার সামনে রাবণ, কংস তো কোন ছার ! যে ঈশ্বর নীরবে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করতে সক্ষম, তাঁকে শরীর ধারণ করে অর্থাৎ অবতার হয়ে দুষ্টকে সংহার করতে হয়েছিল, একথা বলা হাস্যকর এবং ঘোরতর অপমানকর নয় কি? "যখন যখন ধর্মে গ্লানি উপস্থিত হয় তখন তখন ঈশ্বর অবতার হন" একথা বলাও ভ্রান্তি উৎপাদক নয় কি? এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যারা অবতারবাদে বিশ্বাসী তারা প্রায় এই কথাটিকে বারংবার বলে থাকে । কিন্তু একথা তাদের সিদ্ধান্ত অনুসারেই টেঁকে না।

দ্যাখো ! যারা ঈশ্বরের অবতার বিশ্বাস করে থাকে, তারা মুখ্যরূপে দশ অবতার এবং চার যুগ স্বীকার করে। সত্যযুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ আর কলিযুগ। কেমন ? 'সত্যযুগে' ধর্মের চার চরণ, 'ত্রেতা যুগে' ধর্মের তিন চরণ আর অধর্মের এক চরণ স্বীকৃত 'দ্বাপর যুগে' ধর্মের দুই চরণ এবং অধর্মের দুই চরণ। অর্থাৎ অর্ধেক পুণ্য আর অর্ধেক পাপ। 'কলিযুগে' ধর্মের এক চরণ আর অধর্মের তিন চরণ । এবার একটু অবতার ক্রমে বিবেচনা করা যাক্ লোকে জানে, সত্যযুগে চার অবতার, ত্রেতা যুগে তিন, দ্বাপরে দুই আর কলিযুগে এক অবতার। এখন, বিচার্য বিষয় এই, যদি সত্যযুগে ধর্মের চার চরণ ছিল, অধর্ম মোটেই ছিল না সে যুগে চার অবতারের প্রয়োজন কীসের? ত্রেতা যুগের যখন ধর্মের তিন চরণ মেনে নেওয়া হলো এ অবস্থায় তিনটি মাত্র অবতার হলো কেনো? দ্বাপর যুগে

যখন অর্ধেক পাপ আর অর্ধেক পুণ্য, সে অবস্থায় অবতার দু’জন কেনো রয়ে গেল? আর কলিযুগে যখন ধর্মের একটি চরণ রয়ে গেল, আর অধর্মের রয়ে গেল তিন চরণ, সে অবস্থায় একজন অবতার কেনো? আর তাও আবার কলিযুগের শেষে নাকি আবির্ভাব ঘটবে,— এখনও ঘটেনি, তা কেনো? হওয়া উচিত ছিল, অধর্মের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবতারেরও বৃদ্ধি। তা না হয়ে যতই অধর্মের বৃদ্ধি হতে লাগল ততই অবতারের সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল। এবার বলতো, ধর্মের হানি হওয়ার সঙ্গে অবতারদের সম্বন্ধ কোথায় রইল?

কমলঃ কী বলছো দাদা! তাঁরা যে রকম বিষ্ময়কর কর্ম দেখিয়েছেন - তা মানুষ দেখাতে পারে না। যেমন নাকি, গোবর্দ্ধন পর্বত কড়ে আঙ্গুলে ধারণ। একি সাধারণ কোনো মানুষ করতে পারে? এই সব দেখে শুনে স্বীকার করতেই হবে যে, ঈশ্বর বার-বার রূপ ধারণ করে ধরায় আসেন।

বিমলঃ প্রথমতঃ — কেউ আঙুলের উপর পাহাড় তুলেছিল একথা ভুল। যদি দুর্জনতোষন্যায়ানুসারে একথা স্বীকার করেও নেওয়া যায়, তবু এ দ্বারা ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের অবতারের কোনো মহিমা প্রকাশ পায় না। তুমি হয়ত বলবে কেনো? কেনো, তাই বলছি শোনো। যে ঈশ্বর সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি, গ্রহ, উপগ্রহ সমূহকে আপন শক্তিতে ধারণ করে আছেন, তাঁর পক্ষে গোবর্দ্ধন প্রভৃতি পর্বত এক সরষে পরিমাণও নয়। যে ধরার উপর তোমরা বাস করছ, আমরা বাস করছি, সেই ধরার বুকে এক আধটা নয়, লক্ষলক্ষ ছোটবড় পাহাড়পর্বত আছে, সেই ধরাকে ধারণ করে আছেন

ঈশ্বর, সে কথা মনে করলে, বেচারা গোবর্দ্ধন পর্বত নগণ্য নয় কি ? যদি ঈশ্বর বা কোনো ঈশ্বরের অবতার, গোবর্দ্ধন পর্বত আঙুলে তুলে ধরে, সে এমন কোন্ বাহাদুরীর কথা হলো? যদি কোনো এম.এ, অধ্যয়নরত বিদ্যার্থী, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কোনো প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে দেয়, তাহলে সে এমন কোন্ লক্ষ্যভেদ করল ? হ্যাঁ, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র হয়ে যদি কেউ এম.এ, প্রশ্নপত্রের উত্তর দেয় বাস্তবিকপক্ষে সেই প্রশংসনীয়। ঠিক্ তেমনি, মানুষ হয়ে যদি কেউ আঙুলে পর্বত তুলে ধরে তাহলে বলা যায়-হ্যাঁ, এক অদ্ভুত কাজ করেছে বটে। কেননা, মানুষের পক্ষে আঙুলে পর্বত তুলে ধরা কল্পনাতীত। আর যদি সে কাজ কোনো ঈশ্বরের অবতার করে থাকে তাতে বিস্ময়ের কী থাকতে পারে বলো। শুধু তাই নয় এতে তার কোনো মহিমাও প্রকাশ পায় না।

কমলঃ তোমার বিবেচনায় যদি ঈশ্বরের অবতার অসম্ভব একথা মানতেই হয়, তাহলে ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান একথা স্বীকার করি কী করে? যদি ঈশ্বর হয়ে তিনি অবতীর্ণ না হতে পারেন, তাহলে তাঁর মধ্যে 'সর্বশক্তিমানত্ব' থাকল কোথায়? তিনিই সর্বশক্তিমান হওয়ার যোগ্য, যার মধ্যে সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত কিছু করার ক্ষমতা থাকে।

বিমলঃ ভাই শোনো। তুমি একটু তলিয়ে বিচার বিবেচনা করে দেখলে না যে, ঈশ্বর যদি অবতাররূপে আসেন তাহলে তার মধ্যে 'সর্বশক্তিমানত্ব' গুণ থাকবে না। এই অবস্থায় তাঁকে শক্তিহীন হতে হবে। যদি বলো কেমন করে হবে? তো শোনো। যে ঈশ্বর শরীর ধারণ করার

পূর্বে হস্তপদাদি অবয়ব রহিত হয়ে বিশ্বজগৎ রচনা করেছিলেন এখন তাঁকে হস্তপদাদি অবয়বের সাহায্যে কাজ করতে হবে। পূর্বে তিনি চক্ষুরহিত হয়েও দেখতেন, এবার তাঁকে চোখ দিয়ে দেখতে হবে। পূর্বে কর্ণ রহিত হয়ে শুনতেন, এবার কান দিয়ে শুনতে হবে। বলার উদ্দেশ্য এই যে, অবতার হয়ে আসবার আগে তাঁকে অবয়ব রহিত হয়ে কাজ করতে হতো, এবার শরীরের অধীনে থেকে, তাঁকে কাজ করতে হবে ঈশ্বরকে যদি অপরের ভরসায় কাজ করতে হয়, তাহলে তিনি 'সর্বশক্তিমান' হবেন কেমন করে? অল্পজ্ঞ জীব যেমন শরীরের ভরসায় কাজ করে, তেমনি ঈশ্বরকেও শরীরের ভরসায় কাজ করতে হবে। তাহলে তুমিই বল, জীব আর ঈশ্বরে পার্থক্য কী রইল? মানুষকে যেমন শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ব্যাকুল করে তোলে, মানুষের যেমন রাগ-দ্বেষ, জ্বর-জ্বালা হয়, তেমনি শরীরধারী ঈশ্বরেরও হবে।

তাছাড়া সবচেয়ে বড় দোষ ঈশ্বরে আরোপিত হবে — ঈশ্বর অবতার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে পরাধীন হতে হবে,—তিনি স্বাধীন থাকতে পারবেন না। কখনও তাঁর খাওয়ার প্রয়োজন বা কখনও জলের, কখনও বা বস্ত্রাদির আবার কখনও নিবাস স্থানের অর্থাৎ মাথা গোঁজার মত ঠাঁইও প্রয়োজন হবে। যিনি জগতের যাবতীয় কর্ম আপন শক্তিবলে করেন, তাঁকে শরীরের সাহায্যে করতে হবে। এ অবস্থায় তাঁকে সর্বশক্তিমান কোন্ বিচারে বলবো বলো? যদি কোনো ব্যক্তি অন্যকে আপন দৃষ্টি শক্তি প্রভাবে আকৃষ্ট করে জ্ঞানহারা করতে সক্ষম হয়, আর এক ব্যক্তি

কাহাকেও ঔষধ প্রয়োগে জ্ঞানহারা করে বলতো, এ দুজনের মধ্যে কোন জন অধিক শক্তিশালী । এস্থলে সেই শক্তিশালী ব্যক্তি, যেজন দৃষ্টিশক্তিবলে অন্যকে জ্ঞানহারা করতে সক্ষম। যদি বলো কেনো ? কারণ এই যে, সে অপরকে সংজ্ঞাহীন করতে ঔষধের সাহায্য নেয়নি এবার তুমি বেশ ভাল করে বুঝেছ যে, ঈশ্বর সেই অবস্থায় সর্বশক্তিমান হতে পারবেন, যখন তিনি অবতার গ্রহণ করবেন না।

তুমি যে মনে করেছ— সর্বশক্তিমান সম্ভব-অসম্ভব সব কিছুই করতে পারে, এ মনে করা মস্ত বড় ভুল ছাড়া আর কিছুই না । যাঁর মধ্যে সর্বপ্রকার শক্তি আছে তিনি সর্বশক্তিমান, এই হলো সর্বশক্তিমানের বাস্তবিক অর্থ। যিনি সর্বশক্তিমান হবেন তিনি জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থকে অপরের সাহায্য ব্যতীত যেমন যুক্ত করতে পারবেন, তেমনি তাদের বিযুক্তও করতে পারবেন। তিনি সমস্ত জীবকে তাদের কর্মানুয়াযী ফল দিতে এবং সৃষ্টি, স্থিতিও প্রলয় করতে পারবেন । তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বর তাঁর নিজের কর্ম সম্পাদনে অপর কোনো কিছুর সাহায্য গ্রহণ করবেন না । এই হল ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্ত্বা । সর্বশক্তিমানের অর্থ এ নয় যে, তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন ।

কমলঃ ঈশ্বর অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন না? তা যদি না পারেন, তিনি ঈশ্বর হবেন কেমন করে?

বিমলঃ অসম্ভবকে সম্ভব না করা, নিয়মকে অনিয়মের মধ্যে না আনতে পারাই তো ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব । যদি তুমি বল যে, ঈশ্বর অসম্ভবকে সম্ভব

করতে পারেন, তাহলে আমি তোমায় প্রশ্ন করি, আচ্ছা বলতো—"ঈশ্বর কি নিজে নিজেকে মেরে ফেলতে পারেন, না পারেন না?"

কমলঃ ঈশ্বর নিজেকে মেরে ফেলতে পারেন না সত্য, কিন্তু অন্য ঈশ্বরকে অবশ্যই সৃষ্টি করতে পারেন। কেননা, তিনি সর্বশক্তিমান।

বিমলঃ ভাই শোনো,—ঈশ্বর নিজের মতো অন্য ঈশ্বর সৃষ্টি করতে পারেন না, কোনো মতেই পারবেন না। তুমি বলবে কেনো পারবেন না। আচ্ছা, তা বলছি শোনো—মনে কর, পূর্বের ঈশ্বর পুরাতন, তিনি আর একজন নূতন ঈশ্বরকে সৃষ্টি করলেন তাহলে এদের একজন হলেন পুরাতন, আর একজন হলেন নূতন। কেনো? যে ঈশ্বর প্রথমে ছিলেন তিনি অনাদি, আর দ্বিতীয় নূতন যে ঈশ্বরটি হলেন তিনি সাদি অর্থাৎ তাঁর আদি আছে। এক কথায় বলা যায় যে, একজনকে কেউ সৃষ্টি করেনি, আর অপরজনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। একজনের বয়সের সঙ্গে সম্বন্ধে নেই, আর অপর জনের বয়স আজ হতে শুরু হল। কেননা, শেষোক্তটি সৃষ্ট। ঈশ্বর যিনি অনাদি, এঁদের উভয়ের মধ্যে তিনি ব্যাপক, আর যে ঈশ্বরটি সৃষ্টি, তিনি ব্যাপ্য। কেননা, এঁদের উভয়ে ব্যাপক হতে পারেন না। যদি বলো অর্ধেক অর্ধেক ব্যাপক থাকবেন, তাহলে দুই ঈশ্বর সর্বব্যাপক হতে পারবেন না। তাঁদের উভয়ের পক্ষে সর্বব্যাপক হওয়া সম্ভব হবে না। অতএব সর্বশক্তিমান শব্দের অর্থ এ নয় যে, ঈশ্বর সব করতে সক্ষম। ঈশ্বর তাই করতে সক্ষম, যা ঈশ্বরের করা উচিত।

কমলঃ যদি ঈশ্বরের অবতার হওয়া স্বীকার করা যায়, তাতে ক্ষতিই বা কী?

বিমলঃ ■প্রথম ক্ষতি — ঈশ্বরের যখন অবতার হয়ই না, সে অবস্থায় তাঁর অবতার স্বীকার করা মানে, সত্যকে গলা টিপে মেরে ফেলা। এটা একটা মস্ত ক্ষতি নয় কি?

■ দ্বিতীয় ক্ষতি — সমস্ত জগতের যিনি উন্নতি কর্তা সেই ঈশ্বরের অবনতি ঘটবে। কেনো জানো? কেননা, তিনি নারায়ণ হতে নর হয়ে যাবেন। নর থেকে নারায়ণ হওয়া উন্নতির লক্ষণ বলা যেতে পারে, কিন্তু নারায়ণ থেকে নর হওয়া একেবারে নীচে নেমে যাওয়া। কোনো ভিখারী যদি রাজা হয়ে যায়, বাস্তবিক পক্ষে তার উন্নতি হয়েছে জানতে হবে। কিন্তু রাজা যদি ভিখারী হয়, তাকে উন্নতির চিহ্ন কে বলবে? যদি কেহ একথা স্বীকার করে তাকে পাগল ছাড়া কী বলা হবে?

■ তৃতীয় ক্ষতি — বিড়াল তপস্বীর দল নিজেদেকে ঈশ্বরের অবতার বলা আরম্ভ করবে, আর সকল স্ত্রী পুরুষদেরকে জালে জড়িয়ে তাদের ধর্ম নষ্ট করবে। তাদের চেলা বানিয়ে তাদের কাছ থেকে ধন নিয়ে মজা উড়াবে। ভারতবর্ষে এমন বহু বিড়ালতপস্বীর উদাহরণ রয়েছে, যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা করে, নর-নারীর মধ্যে ঈশ্বরের ভাবনাকে মনের সাধে নষ্ট করেছে।

■ চতুর্থ ক্ষতি — ঈশ্বরের অবতার মেনে নিলে মানুষ অপরের অত্যাচার সহ্য করা আরম্ভ করবে। যখন দুষ্ট এবং পাপী অত্যাচার করে, মা বোনদের মান-সম্মান নষ্ট করে সম্পত্তি লুঠতে থাকে, ঘর বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়, তখন অবতারবাদীর দল হাতের উপর হাত দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে, তারা অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিকার করতে অগ্রসর হয় না। তারা মনে মনে ভাবে অন্যায় ও অধর্মকে বাধা দেওয়া তাদের ক্ষমতার বাইবে ভগবান অবতার হয়ে আসলেই দুষ্টের দমন হবে, তবেই ধর্মের স্থাপন হতে পারবে৷ এইভাবে পৃথিবীর ভার হাল্কা হবে। প্রকৃত পক্ষে এ এক মহান্ ভীরুতা৷ এই ভীরুতা এসেছে ঈশ্বরের অবতার স্বীকার করার মধ্য দিয়ে৷

দ্যাখো, যে সমস্ত জাতি ঈশ্বরের অবতার হওয়া স্বীকার করে না, সেই সমস্ত জাতি আপন শত্রুদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হয়ে তাদের শক্ত হাতে প্রতিরোধ করে৷ যারা অবতার বিশ্বাসী নয়, তারা কোনো দিনও স্বীকার করে না যে, অন্যায়কারী এবং অত্যাচারীদের মারধর করার জন্য অবতার কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লাগবে৷ তারা কোনো দিনও ভাবতে পারে না যে, অন্যায়ী এবং অত্যাচারীদের বিনাশ করার জন্য ঈশ্বর অবতার হবেন৷ তারা মনে করে, ঈশ্বর যেমন অত্যাচারীদের হাত, পা প্রভৃতি দিয়েছেন, তেমনি আমাদেরও দিয়েছেন। এই কারণেই সেই সমস্ত জাতি শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে শক্ত হাতে প্রতিকার করার জন্য সামনা সামনি দাঁড়ায়৷ তাঁরা নিজের কর্মকে ঈশ্বরের ভরসায় ছেড়ে দেয়

না। শোনো কমল ! আমি তোমায় সত্য করে বলছি, এই অবতারের সিদ্ধান্তই আর্য জাতিকে বহুভাবে পতিত এবং পদদলিত করেছে। এই অবতারবাদই আত্মবিশ্বাসী আর্যজাতির অন্তর হতে আত্মবিশ্বাসকে (Self Confidence) নির্বাসন দিয়েছে।

কমলঃ দাদা ! আমার উপর তোমার যুক্তির প্রভাব গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে। এবার বলো, ঈশ্বর যদি নিরাকার হয়ে থাকেন তাহলে আমরা তার ধ্যান করব কেমন করে?

বিমলঃ ঈশ্বরের অসীম কৃপা যে, তোমার উপর সত্য সিদ্ধান্তের ছোঁওয়া লেগেছে। তুমি যে প্রশ্ন আজ করলে তার উত্তর আগামীকাল দেওয়া যাবে। কেমন ?

ঈশ্বরকে কিভাবে মনে করব?

(পঞ্চম দিন)

কমলঃ দাদা ! আমি ঠিক্ সময়েই এসেছি । কাল যে প্রশ্ন আমি করেছিলাম, তুমি বলেছিলে আজ তার উত্তর দেবে, এবার উত্তর দাও । বলো, ঈশ্বর যদি নিরাকার হন, তাঁকে মনে করব কেমন করে?

বিমলঃ আচ্ছা, শোনো। 'মনে করা'—তাই না ? মনে রেখো, 'মনে করা' দুই প্রকারের।

■ প্রথমতঃ—জগতের প্রাণী ও জগতের পদার্থকে মনে করা।

■ দ্বিতীয়তঃ- সর্বব্যাপক, সর্বনিয়ন্তা, ইন্দ্রিয়াতীত পরম প্রভু পরমাত্মাকে মনে করা।

জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বস্তু সমূহকে মনে করা যায়, তাদের দর্শন করে, অথবা তাদের বিয়োগ হলে । যথা—এক বন্ধুকে আমি কলকাতায় দেখলাম, তার সঙ্গে পরিচয় হলো । ছ'বছর পর আবার আমি তাকে বোম্বাই নগরে দেখলাম । এবার আমার মনে হলো একে তো আমি কলকাতায় দেখেছিলাম। এবার শোনো বিয়োগ হলে কেমন করে মনে করা যায় — যেমন নাকি, – আমার এক বন্ধু, তার সঙ্গে আমার গভীর

ভালোবাসা। একদিন সে বেড়াতে চলে গেল। এবার তার কথা বার বার মনে হতে লাগল না জানি এখন সে কোথায় আছে। যত সময় আমরা পরস্পরকে দর্শন করি, তত সময় মনে করার কোনো প্রশ্নই আসে না। কেননা, যে বস্তু চোখের সামনে আছে, তার সম্বন্ধে মনে করা আবার কি? যখন পরস্পর বিযুক্ত হলাম, তখন তার কথা মনে জাগল এ হলো জাগতিক বস্তু সমূহকে মনে করা। ঈশ্বরকে মনে করা এ হতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। ঈশ্বরকে মনে করা বা ঈশ্বরের ধ্যান করা, মানে — মনকে নির্বিষয় করা। 'মনে করা' অর্থাৎ মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহে ছড়ানো আত্মিক শক্তিকে আত্মায় একত্র করা। যত সময় মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহ জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, তত সময় আত্মা ঈশ্বরের ধ্যান বা ঈশ্বরকে মনে করতে পারবে না। ঈশ্বরের ধ্যান করার জন্যে মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহকে নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা বিষয়ের প্রতি ধাবিত হতে না দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

মনে রাখতে হবে যে, যোগের অষ্ট অঙ্গের মধ্যে ধ্যান হলো সপ্তম অঙ্গ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা এই ছয়টি অঙ্গের পরিপালন করা সর্বপ্রথম আবশ্যক, তারপর সাধক ধ্যানের অধিকারী হয়। নিয়মানুসারে যোগের ছয়টি অঙ্গের পরিপালন বা অনুশীলন হওয়ার পর ধ্যান স্বাভাবিক ভাবেই হতে থাকে। যখন যোগের ছয় অঙ্গের পর ধ্যানের স্থান, সে অবস্থায় মূর্তির দ্বারা আরম্ভেই কেমন করে ধ্যান হবে?

কমলঃ দাদা! মন যে বড় চঞ্চল,—ছট্‌ফটে। নিরাকারে সে কেমন করে যুক্ত হবে বুঝতে পারছি না? মনকে অভীষ্ট স্থানে যুক্ত করতে হলে সাকার পদার্থের সাহায্য ছাড়া কেমন করে তা সম্ভব হবে? মন নিবিষ্ট করার জন্য সাকার পদার্থ একান্ত আবশ্যক। সাকার পদার্থ ছাড়া মনে স্থিরতা আসতেই পারে না।

বিমলঃ স্নেহের ভাইটি ! তুমি বড় সরল। আরে মন যে নিরাকারেই স্থির হয় একথা জানোনা? সাকারে যে স্থির হতেই পারবে না। কেননা, সাকার পদার্থ যে, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বিষয় যুক্ত তাই মন ঐ সব বিষয়ে আবদ্ধ হয়ে নিজের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। যদি সাকার পদার্থে মন স্থির হতো, তাহলে জগৎটাই তো আকার যুক্ত, অর্থাৎ সাকার। যেহেতু জগৎটা সাকার, অতএব সকলের মন জগতে স্থির হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু তা তো হয় না। জাগতিক বস্তুতে যতই মন প্রবেশ করেছে, ততই তার মনে চঞ্চলতা অধিকতর হচ্ছে। যদি আরও একটু গভীরভাবে বিচার করো তাহলে বুঝতে পারবে যে, মন কখনও স্থির হয় না, মন স্থির হওয়া মানেই মরণ। মন অথবা হৃদয়ের গতি রুদ্ধ হওয়াই মরণ। মন কোথাও স্থির হচ্ছে না — মানে, মানুষ মরে নাই। বাস্তবিক পক্ষে মনের বাহ্য বৃত্তি সমূহের অন্তর্মুখী হওয়াকেই মানসিক স্থিরতা বলে। মানুষ যত সময় বেঁচে থাকবে তত সময় তার মন গতিশীল থাকবে।

কমলঃ তাহলে, তুমি বলতে চাও যে, যারা মূর্তিপূজা দ্বারা ঈশ্বরের ধ্যান করে তারা সব ভুল করে। আমার বিবেচনায় মূর্তি দ্বারা মনের চাঞ্চল্য

দূর হতে পারে। এই জন্যই তো মানুষ শ্রীরাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেব দেবীর মূর্তি পূজা করে থাকে।

বিমলঃ মূর্তি পূজা দ্বারা ঈশ্বরের ধ্যান কোনো কালেও হতে পারে না। আমি প্রথমেই বলেছি যে, ধ্যান মানে মনকে বিষয় শূন্য করা অর্থাৎ মনের ঝুলিতে কোনো জিনিষটি থাকবে না, মনের ঝুলিটিকে একেবারে খালি করে রাখতে হবে।

একটু ভেবেই দ্যাখো, মূর্তিতে কী আছে? মূর্তিতে পঞ্চ বিষয় বিদ্যমান। মোটামুটিভাবে বিচার করলে দেখবে মূর্তিতে 'রূপ' আছেই। ফল, সন্দেশ, দুধ, জল যা সমর্পণ করা হয় তাতে 'রস' আছে। মূর্তি পূজায় যে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয় সেই ফুলে 'গন্ধ' আছে। পূজার সময়, কাঁসর, শঙ্খ, ঘন্টা বাজান হয় তাতে 'শব্দ' আছে। বিষয় রূপ মূর্তিটাই পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা নির্মিত সেই পঞ্চতত্ত্ব নির্মিত মূর্তিতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ আছে। এই অবস্থায় মনের চঞ্চলতা মূর্তির দ্বারা কেমন করে দূরে হতে পারে?

যদি মূর্তি দ্বারা মনের চাঞ্চল্য দূর হতো তাহলে মূর্তিপূজক, শ্রীকৃষ্ণকে যে ভগবান বলে থাকে সেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুর্ধর অর্জুনের সামনে কেনো, অতি নিকটে থেকেও, তার মনের চঞ্চলতা দূর হয় নি কেনো? তার মনে চঞ্চলতা যেমন তেমনই ছিল, আদৌ দূর হয়নি। অর্জুনের মনের চঞ্চলতা দূর হলে কি শ্রীকৃষ্ণকে সে প্রশ্ন করত?

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢম্।

তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্"॥ গীতা ৬/৩৪ ॥

অর্থাৎ - হে কৃষ্ণ মন যে বড়ই চঞ্চল, বড় শক্তিধর, হঠকারী, একে স্ববশে আনা, বায়ুকে গাঁঠরী বাঁধার মত দুষ্কর, বড়ই কঠিন।

একথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলেছিলেন—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ গীতা ৬/৩৫ ॥

অর্থাৎ - হে অর্জুন। মন যে বড় চঞ্চল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, মনকে নিগ্রহ করা দুষ্কর তা আমি জানি, কিন্তু মনে রেখো, এই প্রবল ও দুর্নিগ্রহ চঞ্চল মনকে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা বশে আনা যায় — অর্থাৎ বশে আনা অসম্ভব নয়।

বাস্তব শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সামনে মূর্তিমান থেকেও অর্জুনের মন স্থির হলো না, সে সময় তো তাঁকে দিনরাত সে প্রত্যক্ষ করছিল কিন্তু মানুষ আজ তার জড়মূর্তি সামনে রেখে চঞ্চল মনকে স্থির করার দুঃসাহস দেখায়। এতে কি কখনও মন স্থির হতে পারে?

কমলঃ তাহলে মূর্তিপূজা করাই উচিত নয় বুঝি?

বিমলঃ হ্যাঁ, মূর্তি পূজা করতে হবে বৈকি তবে, সে মূর্তির পূজা কেমন জানো? জড় মূর্তির পূজা জড়ের মতো, আর চেতন মূর্তির পূজা চেতনের মত কর উচিত।

কমলঃ জড়মূর্তির পূজা জড়ের মতো, আর চেতন মূর্তির পূজা চেতনের মতো করা উচিত, এ কথার রহস্য বুঝলাম না। একটু পরিষ্কার করে বললে বুঝতে পারি।

বিমলঃ 'পূজা' শব্দের ধাতুগত এবং ব্যবহারিক প্রভৃতি কয়েক প্রকারের অর্থ হয়। 'পূজা' অর্থাৎ আদর, যত্ন করা, যাকে সংস্কৃতে — সৎকার বলা হয়। কোনো বস্তুর যথাযথ ব্যবহার, কোনো বস্তুর যথাযথভাবে রক্ষা, কাহাকেও যথাযথ দান দেওয়াকেও পূজা বলে। এবার একটু বিচার-বিবেচনা করে জড়মূর্তি পূজার অর্থ চিন্তা কর। জড়মূর্তি পূজা মানে, সেই জড়মূর্তিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখা। মূর্তিটিকে এমন স্থানে স্থাপন করবে, যেথায় সেই মূর্তিটির কোন প্রকার ক্ষতি না হয় অর্থাৎ যেন ভেঙে না যায়, ময়লা না হয়, তার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট না হয়, অবহেলিত হয়ে না থাকে এখানে মূর্তি পূজা অর্থাৎ জড়মূর্তির যথাযথ উপযোগ, উচিত রক্ষণাবেণ। পূজা মানে এ নয় যে, প্রত্যেক বস্তুর সামনে ঢিপ্-ঢিপ্ করে মাথা ঠুকে তাতে ফুল বেলপাতা, তুলসীপাতা, ফল-মিষ্টি-নৈবদ্য অর্পণ করা। যেমন নাকি, একজন আর একজনকে বলল—আরে ভাই ! এই সাধুজীর 'পেট পূজা' করিয়ে দাও। এর মানে কী? না, সাধুকে খাইয়ে দাও। ওর মানে

এ নয় যে, সাধুর পেটের উপর এক গুচ্ছ বেলপাতা, ফুল-ফুল, মিষ্টি রেখে তাকে প্রণাম কর। ঠিক্ এমনি— একজন আর একজনকে বলল—এই যে গুণ্ডাকে দেখছ, কেবল বাজে বকেই যাচ্ছে, যা তা বলছে, পিঠ পুজো করে দাও, তবে এ শান্ত হবে— নইলে হবে না। এর মানে—এর পিঠে আচ্ছা করে কয়েক ডাণ্ডা কষে দাও। পিঠ পূজার অর্থ এ হবেনা যে, কিছু বেলপাতা, ফুল, ফল পিঠের ওপর রেখে প্রণাম কর। দেখলে একস্থানে পূজার অর্থ হল খাওয়ান, আর একস্থানে অর্থ হল মার দেওয়া। ঠিক্ এমনি জড়মূর্তি পূজার অর্থ—মূর্তিকে যথাস্থানে সুরক্ষিত রাখা, যেন তার চাক্‌চিক্য নষ্ট না হয় — ময়লা না হয়। জড়মূর্তির ওপর ফুল-ফল অর্পণ, এবং তার সামনে মাথা ঠুকে প্রণাম করার অর্থ মূর্তি পূজা নয় কেননা, মূর্তিতে সে যোগ্যতা নেই যে, সে তোমার ভক্তি শ্রদ্ধা, অনুভব করবে এবং সে ফল-ফুল-মন্ডামিঠাই খাবে।

যত সজীব বা চেতন মূর্তি এ জগতে আছে— যথা মাতা, পিতা, গুরু, অতিথি, সন্ন্যাসী, উপদেশক তথা অন্যপ্রাণী, এরা সবাই ফল-ফুল-মন্ডা-মিঠাই পেয়ে লাভবান হয়। ফল-ফুল, মন্ডা, মিঠাই প্রভৃতি দ্বারা বিবিধ প্রকারে তাদের পূজা করা উচিত। এখানে 'পূজা' অর্থ আদর যত্ন করা - সংস্কৃতে যাকে সৎকার বলে। এর নাম সজীব মূর্তি পূজা।

কমলঃ ঈশ্বর যদি সর্বত্র বিদ্যমান থাকেন, তিনি মূর্তিতেই বা থাকবেন না কেনো? যদি মূর্তিতে ঈশ্বর থাকেন, তাহলে মূর্তি পূজা করায় দোষ

কোথায়? যারা মূর্তি পূজা করে তারা মাটি বা পাথরের পূজা করে না, ব্যাপক পরমাত্মারই পূজা করে।

বিমলঃ একথা সত্য যে, ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান বলে, তিনি মূর্তিতেও ব্যাপক। কিন্তু তিনি সর্বত্র আছেন বলে সব স্থানে সর্ববস্তুতে তাঁর পূজা হয়, এর মূলে কোনো যুক্তি নেই! দ্যাখো, পূজা যে করে সে 'জীবাত্মা' পূজার উদ্দেশ্য কী? জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন। কেমন? মিলন— কখন হয় —যখন উভয়ে উপস্থিতি থাকে। মূর্তিতে ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু সেখানে 'জীবাত্মা' নেই। এ অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হবে কেমন করে। হ্যাঁ, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েই বর্তমান, তাই সেখানেই উভয়ের মিলন সম্ভব। অতএব যে মানুষটি ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে চায়, তাকে আপন হৃদয়েই মন এবং ইন্দ্রিয়কে স্ব-অধীন করে ঈশ্বরের পূজা করা কর্তব্য।

দ্যাখো! ঈশ্বর সর্বত্র, এ কথা জেনেও কি সব জল পানের যোগ্য ? সিংহ এবং সাপ উভয়েই পরমাত্মায় ব্যাপক, এ অবস্থায় আমি জিজ্ঞাসা করি, সিংহ ও সাপের কাছে যাওয়া কি উচিত? অতএব, পরমাত্মা মূর্তিতেও ব্যাপক আছেন সুতরাং মূর্তির পূজা করা উচিত, একথা বলার মত অজ্ঞানতা ও মূর্খতা আর কী হতে পারে? পরমাত্মা মিছরীর টুকরোতেও আছেন, বিষেও আছেন, তাই বলে কী বিষ খাওয়া উচিত? কদাপি নয় সেই জিনিষই খাওয়া উচিত যা খাওয়ার যোগ্য। মূর্তি পূজক মনে করবে যে, সে মূর্তিতে ব্যাপক পরমাত্মার পূজা করছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে

মূর্তির দ্বারা ব্যাপক ঈশ্বরের পূজা হয় না। হয়ত তুমি বলবে, কেনো হবেনা? কেনো হবে না, তাই বলছি। যে সমস্ত বস্তু মূর্তির ওপর দেওয়া হয় যথা— বেলপাতা, ফুল, চাল, কলা, গামছা, কাপড় ইত্যাদি, তাতেও তো পরমাত্মা ব্যাপক আছেন। যথা—আকাশ ঘটেও ব্যাপক এবং ইটেও ব্যাপক এই অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি ঘটে আকাশ ব্যাপক এই মনে করে ইটটা তুলে ঘটাকাশে ছুঁড়ে মারে, তাহলে সে ভুল করবে। কেননা, আকাশ ব্যাপক হওয়ায় আকাশের গায়ে ইঁট লাগতে পারে না, ইঁট তুলে যদি ঘটে আঘাত করা যায় তাহলে ঘট ভেঙে যাবে, কিন্তু আকাশ ভাঙবে না। কেননা আকাশ যে, সে ইটেও ব্যাপক ঠিক তেমনি, যে কোনো ব্যক্তি যদি সে পত্র-পুষ্প, ফল-জল, মিষ্টি আদি মূর্তির সামনে বা মূর্তির উপর, অর্পণ করে তা মূর্তিতেই অর্পিত হয়, ঈশ্বরে নয়। কেননা, ঈশ্বর যে ঐ সব পদার্থেও ব্যাপক।

কমলঃ মূর্তির উপর বা সামনে ফল, ফুল প্রভৃতি না হয় অর্পণ নাই বা করলাম, কিন্তু সেই মূর্তিকে শ্রদ্ধা সহকারে দর্শন করলে ব্যাপক পরমাত্মা এবং তাঁর মহিমার জ্ঞান অবশ্যই হবে।

বিমলঃ এও উল্টো কথা বলছো। একটু ভেবে দ্যাখো, দর্শনে ব্যাপক পরমাত্মার এবং তাঁর মহিমার জ্ঞান কেমন করে হবে? শোনো। তিলে, তেল ব্যাপক আছে,—কেমন? কিন্তু, যে তিলকে দ্যাখে, সে দ্যাখে তিলকে, তিলে তেল দ্যাখে কী? সে তো তিলই দেখবে, তাই তো? সে যতই শ্রদ্ধা এবং মনযোগ সহকারে তিলকে দর্শন করুক না কেনো, সে

তিলই দেখবে, তিলে তেল দেখতে পারবে না। তেল দেখবে কখন, যখন সেই তিলকে ঘানিতে ফেলে পেষণ করা হবে,—তখন। এইভাবে মূর্তিতে ঈশ্বর ব্যাপক আছেন, সত্য, কিন্তু দর্শক সেই মূতিকে দর্শন করে মাত্র ঈশ্বরকে সে দর্শন করে না। ঈশ্বর দর্শন তখনই সম্ভব, যখন দর্শক জড়মূর্তির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে আত্মায় সেই ব্যাপক পরমাত্মার সন্ধান করবে। বাকী রইল ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞান। সেও তো মানুষের গড়া মূর্তিতে ঈশ্বরের মহিমা দর্শন? তাই বা কেমন করে হবে? মানুষের গড়া মূর্তিতে শিল্পীর মহিমাই প্রকাশ পায়। মূর্তি-দর্শক বলবে— "বাঃ, বলাই পাল কী ঠাকুরই না গড়েছে, যেন কথা কইছে, কী অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য।" এ কার মহিমা? এ সেই মূর্তি রচয়িতার মহিমা, ঈশ্বরের নয়। হ্যাঁ, পরমাত্মা যা নিমার্ণ করেছেন তাতে পরমাত্মার মহিমা দর্শন করতে পারবে, দেখতেও পাবে। তুমি পরমাত্মার মহানতা দর্শন করতে চাও তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রচনা বিচার বিবেচনা করে সন্ধান কর, দেখবে ঈশ্বরের রচিত ক্ষুদ্রাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম বস্তুতে কী অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল! মানুষের তৈরী জড় মূর্তিতে পরমাত্মার মহিমার কোন চিহ্নটা রয়েছে যে, তুমি তা দেখতে পাবে?

কমলঃ দাদা! ফল সদাসর্বদা ভাবনাময়ই হয়ে থাকে। মূর্তিকে ঈশ্বর না মেনেও আমরা তাতে ঈশ্বরের ভাবনা আরোপ করে ফল লাভ করতে পারি। দ্বিতীয় কথা, যদি কোনো লোক এক লাফে খুব উঁচুতে উঠতে না পারে, তার জন্য মই বা সিড়ি প্রয়োজন। আমি মূর্তি পূজাকে ঈশ্বর প্রাপ্তির

প্রথম সিঁড়ি বলেই মনে করি। অতএব যদি কোন লোক ভগবানের কল্পিত মূর্তি তৈরী করে, তাতে ঈশ্বরের ভাবনা আরোপ করে পূজা করে, আমি তাতে কোনো দোষ দেখি না।

বিমলঃ তোমার মনে রাখা উচিত যে, ভাবনা কোনো পদার্থের বাস্তবিকর্তাকে অর্থাৎ সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। কোনো মানুষ যদি অজ্ঞানতা বশতঃ চুনের জলে দুধের ভাবনা আরোপ করে তাকে মন্থন করে, তা বলে তুমি কি বলতে পারো, তা থেকে সে মাখন পাবে? জলে অগ্নির ভাবনা করে শীতার্ত ব্যক্তি কি শীত দূর করতে পারবে? পাথরে রুটির ভাবনা করে কি মানুষ তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারবে? ভাবনা বা মনে করলেই যদি প্রত্যেক জিনিষ পাওয়া যেতো, তাহলে জগতে কেহই দুঃখী ও নির্ধন থাকত না । আর কাহাকেও কোনো বস্তুলাভ করার জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রমও করতে হতে না। সেই ভাবনাই বাস্তবিক ভাবনা, যার আধার সত্য, নইলে সে অভাবনা । কোনো মানুষ যদি জোলাপের গুলিকে হজমীর গুলি মনে করে তা খায়, তার কি পেট খারাপ হবে না? তাই বলছিলাম — কোনো বস্তুতে ভাবনা আরোপ করে সেই বস্তু লাভ করার আশা নিরেট বোকামী।

দ্যাখো, সোমনাথের মন্দিরের মূর্তিতে পূজারীদের জড় ভাবনা ছিল না, সোমনাথ যে সাক্ষাৎ মহাদেব। যখন মহমুদ গজনবী সোমনাথ মন্দিরের উপর আত্রমণ চালাল, তখন পাণ্ডা এবং পূজারীর দল নিশ্চিন্ত মনে, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিল। তারা বলতে লাগল—সকলে মিলে সোমনাথের

জপ কর, তিনি নিজেই ম্লেচ্ছকুল নাশ করবেন, আমাদের লড়াই করার কোনো প্রয়োজনই নেই। এই ভাবনা এবং বিশ্বাসের পরিণাম কী হয়েছিল? ইতিহাস পাঠকদের জিজ্ঞাসা করো। তারা বলবে এর পরিণাম কী হয়েছিলো। এর পরিণামের কথা সকলে ভাল করে জানে।

শুধু সোমনাথই বা কেনো? এই ভাবনার বশবর্তী হয়ে সহস্র মন্দির ও মূর্তি গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। লুণ্ঠনকারীদল কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুটে নিয়ে বিদেশে চলে গেল এ সব দেখে শুনেও মূর্তি পূজকদের অন্ধ বিশ্বাস ঘুচলো না। কী আশ্চর্যের কথা! নির্জীব— অচেতন জড় মূর্তি, যে কিছুই করতে পারে না, মানুষ কিনা সেই জড় মূর্তিতে সৃজন ক্ষমতার ভাবনা আরোপ করল! কী ভয়াবহ অন্ধবিশ্বাস? আর যারা চেতন, যারা সব কিছু করতে সক্ষম তাদের উপর কিনা, না করতে পারার ভাবনা আরোপ করল! আমাদের দেশের এবং জাতির অধঃপতনের মূল কারণই এই। এবার তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ অজ্ঞানতাপূর্ণ ভাবনা আরোপ কত ভয়াবহ ও দুঃখ-জনক হতে পারে।

তুমি যে বলছো মূর্তি পূজা ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রথম সোপান বা সিঁড়ি - এ একেবারে ডাহা মিথ্যা। হ্যাঁ, চেতন মূর্তির পূজা ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রথম সোপান কিছু অংশে স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু জড় মূর্তির পূজা তো কোনো মতেই স্বীকার করা যেতে পারে না। জড় মূর্তি পূজাকে হিমালয় পাহাড়ের ওপর আরোহণ করার প্রথম সোপান যদিও মেনে

নেওয়া যায়, কিন্তু যে মূর্তি জ্ঞানশূন্য, তাকে ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রথম সোপান কেমন করে মেনে নেওয়া যেতে পারে?

যদি কেহ ইংরেজী ভাষায় কথা বলা শিক্ষা করতে চায়, তাহলে তার ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান হবে, এ, বি, সি, ডি প্রভৃতি বর্ণ। যদি কেহ সংস্কৃত বা হিন্দী ভাষায় কথা বলা শিক্ষা করতে চায়, তাহলে তাকে সংস্কৃত বা হিন্দি শিক্ষার প্রথম সোপান শিক্ষা করতে হবে অ, আ, ই, ঈ প্রভৃতি বর্ণমালা। কিন্তু যদি কেহ এ, বী, সী, ডী প্রভৃতি বর্ণকে সংস্কৃত শিক্ষার প্রথম সোপান মনে করে এ, বী, সী, ডী পড়তে আরম্ভ করে তা হলে কি সে সংস্কৃত শিক্ষা করতে পারবে? যার সিঁড়ি যা, তা দিয়েই কৃতকার্যতা লাভ করা যেতে পারে। ঈশ্বর প্রাপ্তির সিঁড়ি বা সোপান হলো চেতন প্রাণীর নিষ্কাম সেবা, সৎসঙ্গ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এইসব সিঁড়ির উপর নিরন্তর আরোহণ অর্থাৎ এদের বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান দ্বারাই ঈশ্বর প্রাপ্তি হতে পারে। তুমি যে প্রশ্ন করলে— ঈশ্বরের কাল্পনিক মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করার দোষ কোথায়? দোষ একটা নয়–বহু।

■ প্রথম দোষ - নকল বস্তুতে আসল বস্তুর গুণ আছে মনে করে মানুষ নিজে নিজেকে প্রতারণা করবে। পশু, পাখী, পোকামাকড়ও ভালভাবে জানে যে, কোনো মেকীবস্তু আসল হয়ে কাজে লাগবে না। বিড়ালের সামনে মাটি বা রবারের ইঁদুর রেখে দিয়ে দেখো, সে কখনও তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরতে যাবে না। মৌমাছির সামনে কাগজের ফুল

রেখে দিয়ে দেখো, সে ভুলেও আসল ফুল মনে করে তাতে মধু খাওয়ার জন্য বসবে না। এইভাবে অন্য প্রাণীরাও মেকি বস্তুর সঙ্গে প্রেম করে না, করবে না। কিন্তু মানুষ, যে প্রাণী জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবীদার তারাই মেকি বস্তুর কাছ থেকে যথেষ্ট ফল পাবার আশা করে এবং তাতে আসক্ত হয়। হায়! এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী হতে পারে?

■ দ্বিতীয় দোষ — ঈশ্বরের কাল্পনিক মূর্তি পূজক ঈশ্বরকে নিজের মতই ভাবে। নিজের প্রয়োজনীয় বস্তুর মতো তারও প্রয়োজন আছে মনে করে। যথাঃ—মানুষ যেমন নিজের জন্য ভোজনের প্রয়োজন অনুভব করে, ঠিক্ তেমনি সেও ঈশ্বরের ভোজনের প্রয়োজন আছে মনে করে থালায় নৈবেদ্য ও ভোগ সাজিয়ে দেয়। যেমন সে নিজে কাপড় পরে। তেমনি সে কল্পিত ঈশ্বরের মূর্তিকেও কাপড় পরায়, সে যেমন নিজে স্নান করে, তেমনি সেই কল্পিত ঈশ্বরের মূর্তিকে জল দিয়ে স্নান করায়। সে যেমন নিজে ঘুমায় এবং জাগে, তেমনি সে তার কল্পিত ঈশ্বরের মূর্তিকেও ঘুম পাড়ায় এবং জাগায়। সে যেমন নিজে অলংকার ধারণ করে, তেমনি সে কল্পিত ঈশ্বরের মূর্তিকেও অলংকার ধারণ করায়। মানুষ যখন ঈশ্বরেও নিজের মতো অভাব ও প্রয়োজন অনুভব করে, সেই অবস্থায় অভাবগ্রস্ত ঈশ্বরের কাছে কোনো কল্যাণের আশা করা যেতে পারে কিনা সে বিচার তুমিই কর। যে ঈশ্বর নিজেই অভাবগ্রস্ত সে অন্যের অভাব মোচন করবে কেমন করে? তুমিই বলো— একজন অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাবে কেমন করে? অন্ধ কি অপর অন্ধকে পথ দেখাতে পারে?

■ তৃতীয় দোষ—ঈশ্বর এক, আর তাঁর মূর্তি অনেক। কেননা, যতগুলি সম্প্রদায় তারা তাদের আপন আপন বিশ্বাস মতে ততগুলি মূর্তি গড়ে থাকে। পরিণাম পরস্পর রাগ-দ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ থেকেই যায়। ঝগড়া-বিবাদ জাতীয় সংগঠনের পক্ষে মহান ক্ষতিকর এরূপ আরও অনেক দোষ দেখান যেতে পারে।

কমলঃ তোমার বলার উদ্দেশ্য - মূর্তি তৈরী করাও উচিত নয় আর মূর্তির পূজা করাও উচিত নয়। আমার মনে হয়, অবশ্য আমি যতদূর বুঝি—শান্ত-রাগ-রাগিণীময় গীত মহাপুরুষদের চিত্র এবং মূর্তি দর্শনে মনে শান্তি আসে আর ভক্তের চিত্তে তার বেশ ভাল প্রভাবও পড়ে

বিমলঃ আমার বলার উদ্দেশ্য মোটেই এ নয় যে, কারো মূর্তি গড়বে না, কারো ফটো বা ছবি তৈরী করবে না। আমি চিরদিনই বলে আসছি—মূর্তি গড়া প্রয়োজন। বিশ্বের মহাপুরুষদের মূর্তি অথবা চিত্র তৈরী করলে তাঁদের স্মৃতি রক্ষা করা হয় কিন্তু এর মানে এই নয় যে, চেতন মানুষের মতো তাদের পূজাও করা উচিত। অথবা তাঁদের সকলকে পরমাত্মা বা পরমাত্মার প্রতিনিধি বোধে তাঁদের কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের আশায় প্রার্থনা করা উচিত। প্রাণহীন বস্তু চিরদিনই প্রাণহীন তার মধ্যে জীবিত মানুষের বা সর্বব্যাপক ঈশ্বরের স্থূলাভিষিক্ত হয়ে কর্ম করার যোগ্যতা কোথায়? যে পিতা জীবিত অবস্থায় সন্তানকে স্নেহ করতে

সক্ষম, মৃত্যুর পর সে কি সন্তানকে স্নেহ করতে পারে? যে শরীরে পিতা আপন সন্তানকে কোলে বসিয়ে খাইয়েছে, সেই প্রাণহীন শরীর কি সন্তানের কোনো কাজে লাগে? পিতার সেই প্রাণহীন শরীরে এবং পাথরের বা মাটির তৈরী মূর্তিতে পার্থক্য কোথায়? হ্যাঁ, সামান্য তফাৎ অবশ্যই আছে বলা যেতে পারে। পাথর বা ধাতু নির্মিত মূর্তি পচে গলে যায় না, আর প্রাণহীন শরীর পচে-গলে যায় - তাছাড়া উভয়ের একই অবস্থা। জড় দেবতার পূজার অর্থ হলো তাদের যথাযোগ্য ব্যবহার করা। যদি যথাযথভাবে তাদের ব্যবহার না করা হয়, তাহলে সেই বস্তু সমূহই মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হতে বাধ্য। যদি বলো সে কেমন করে হয়? তো শোনো।

একজন গঙ্গার বড় ভক্ত। সে রাতদিন তার পূজায় রত থাকে। গঙ্গায় ফুল, নৈবেদ্য অর্পণ করে, গঙ্গা লহরী স্তোত্র পাঠ করে। কিন্তু সে সাঁতার কাটা জানে না। একদিন সে গঙ্গায় নেমে পূজা করছে এমন সময় হঠাৎ সে গঙ্গার গভীর জলে তলিয়ে গেল, — গঙ্গার ভক্ত ডুবে গেল। এতদিন সে গঙ্গার কতো পূজো করেছে–আরাধনা করেছে, আর কিনা সেই গঙ্গা, তার ভক্তকে একেবারে পেটে পুরে নিল! কই, সে যার এত স্তোত্র পাঠ করত, পুজো পাঠ করত, গঙ্গা তাকে ছাড়ল না তো? এখানে ছাড়াছাড়ি নেই সে তার যত শ্রদ্ধা-ভক্ত দিয়েই পূজা করুক না কেনো? ফুল, বেলপাতা আর যত ইচ্ছা ঘটি বা কলসী-কলসী দুধ ঢালুক না কেনো, সে

যত বড় ভক্তই হোক না কেনো, সাঁতার না জানার জন্য তাকে গঙ্গার পেটে যেতেই হবে।

আর একজন গঙ্গাকে "গঙ্গা মা" মনে না করে নদী মনে করত। সে বোধ হয় কাউকে হত্যা করেছিল। তাই তার হাত পা ছিলো রক্তে রক্তাক্ত। ধরা পড়ার ভয়ে সে সাকার গঙ্গা নদীতে দিল ঝাঁপ। সে সাঁতার জানত, আরকী ভয়? গঙ্গার বুক চিরে সাঁতার কেটে সে পার হয়ে গেল। একজন 'গঙ্গা মায়ের' পুজো করে ডুবে মরল, আর একজন গঙ্গাকে জড় জেনে তার যথার্থ ব্যবহার করে রক্ষা পেল এমনটা হলো কেনো জানো? একজন জলের যথাযথ ব্যবহার করা জানত, তাই সে সাঁতার কেটে পার হয়ে গেল, আর একজন জলের যথাযথ ব্যবহার জানত না, তাই গঙ্গার পূজা করেও সে ডুবে গেল। একজন বেঁচে গেল, আর একজন মরে গেল।

একদল গঙ্গা পূজক আছে তারা মনে করে শুধু গঙ্গা স্নান করলেই মুক্তি হবে। তারা প্রতি বৎসর লক্ষলক্ষ, কোটি কোটি টাকা রেল কোম্পানীকে দিয়ে থাকে। তারা টাকা দেয়, টাকা দিয়ে গাড়ীতে ধাক্কা খায়, তারপর হয়রানি, তারা মনে করে গঙ্গায় স্নান করলে— প্রণাম করলে, ফল-মূল গঙ্গায় দিলে গঙ্গার পূজা হবে। আর একদল আছে যারা গঙ্গা হতে খাল কেটে লক্ষলক্ষ বিঘে জমিতে জল দিয়ে জমিকে উর্বরা করাকে গঙ্গাপূজা মনে করে। তারা গঙ্গার প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করছে, চাকী চালাচ্ছে। তারা কোনোও দিন পুণ্যের আশায় গঙ্গায় স্নান করে না। কিন্তু তারা গঙ্গাকে পাইপের মধ্যে দিয়ে নিজের ঘরে এনেছে, আর নানা

প্রকারে তার দ্বারা লাভবান হচ্ছে। এইভাবে তারা জড় পদার্থের যথাযথ ব্যবহার দ্বারা জড়ের পূজা করে চলছে এইভাবে প্রত্যেক জড় পদার্থের বিষয়ে উদাহরণ উপস্থিত করা যেতে পারে।

শেষে রইল, মূর্তি বা ছবি বা ফটো দেখে প্রভাব সৃষ্টির কথা। এ বিষয়ে একটু বিচার বিবেচনা করে দ্যাখো–একটু ভাবো। মনে রাখবে মূর্তি দেখলেই চিত্তে ভাল মন্দের প্রভাব পড়ে না, কিন্তু যে প্রভাবটা পড়ে সেটা আন্তরিক সংস্কারের কারণেই পড়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে। একজন হিন্দু সে শ্রীরাম বা কৃষ্ণের মূর্তি দর্শন করল, সেই মূর্তির সামনে মাথা নত করে প্রণাম করল জানো, সে মূর্তির সামনে মাথা নত করল কেনো? সে শ্রীরাম ও কৃষ্ণের ইতিহাস জানত। তার অন্তরে তাঁদের সম্বন্ধে সংস্কার ছিল যে, শ্রীরাম ও কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার ছিলেন, তাঁরা রাবণ ও কংসকে সংহার করেছিলেন সে পুস্তক পাঠ করেই হোক বা অন্যের কাছে শুনেই হোক্, তার মনের মধ্যে এইরূপ সংস্কার জমা হয়েছিল। তাই সে তাঁদের মূর্তি দেখে প্রভাবিত হয়েছে।

আর যদি সেই হিন্দুর সামনে কোনো জাপানী দেবতা 'কন্‌ফিউশিয়াস' এর মূর্তি রেখে দেওয়া হয় তাহলে কি সেই মূর্তি দেখে তার মনে প্রভাব সৃষ্টি হবে? জাপানী দেবতাকে দেখে তার মনে শ্রদ্ধা জন্মাবে না কেননা, 'কন্‌ফিউশিয়াস' সম্বন্ধে তার কিছুই জানা নেই। যে ব্যক্তিটির অন্তরে 'কন্‌ফিউশিয়াস' সম্বন্ধে কোনো সংস্কারই নেই, সেই মূর্তি দেখে তার মাথা নত হয় না।

একজন অহিন্দু সে হিন্দুর কোনো দেব-দেবীর মূর্তিকে দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে না। এর কারণ — সেই অহিন্দুদের মনে হিন্দুদের দেব-দেবী সম্বন্ধে কোনো সংস্কার নেই। একজন মুসলমানের কাছে এক দুর্বল তথা কুরূপ মুসলমানের ছবি ভাল, কিন্তু কোনো হিন্দুর দেব দেবীর ছবি তার কাছে ভাল নয়, কেননা, তাদের সম্বন্ধে তার মনে একটুও শ্রদ্ধা নেই। হিন্দু দেব-দেবীদের চিত্র মুসলমানদের কেনো ভাল লাগে না? তার কারণ তারা যে মোমিন বা তারা যে ইসলামের একজন সহায়ক এই সংস্কার তাদের মনে দৃঢ় হয়ে আছে। এবার তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, মনে যা কিছু প্রভাব পড়ে সে তাদের আপন আপন সংস্কারের জন্য পড়ে, মূর্তি দেখে প্রভাব পড়ে না। যদি মূর্তি দেখে প্রভাব পড়ত, তাহলে প্রত্যেক মানুষের মনে মূর্তির দর্শন মাত্রই তাদের মনে প্রভাব পড়ত এবং তাদের মনে শান্তি আসত, কিন্তু তা হয় না।

কমলঃ স্কুলে মানচিত্র দেখান হয়। ছোট্ট মানচিত্র দেখে যদি বিশাল পৃথিবীর জ্ঞান হতে পাবে, ছোট্ট ছবি বা মূর্তি দেখলে বিশাল ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ হবে না কেনো?

বিমলঃ স্নেহের ভাইটি, শোনো। মানচিত্র সাকার জগতেরই হয়ে থাকে। সেই মানচিত্র দ্বারা নদী, হ্রদ, পাহাড়-পর্বত, নগর, রাজপথ, রেল, বন, উপবন প্রভৃতির জ্ঞান করান যেতে পারে। কিন্তু যে ঈশ্বর সর্বব্যাপক এবং নিরাকার, তার মানচিত্র বা ছবি কী করে সম্ভব হবে? সম্ভব হয় না, তা দিয়ে ঈশ্বরের জ্ঞানও হয় না।

কমলঃ অক্ষর এবং শব্দ নিরাকার, কিন্তু দ্যাখো তারও মূর্তি আছে। সেই নিরাকার শব্দের অক্ষর তৈরী করে ছেলেদের বোধ করান হয়। যদি অক্ষর এবং শব্দের আকার সৃষ্টি না হত, তাহলে ছেলেরা কেমন করে বিদ্যালাভ করতে পারত ? তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে বলা চলে কিনা?

বিমলঃ দ্যাখো, অক্ষর এবং শব্দ চোখ দিয়ে দেখা যায় না, যায় কী? কিন্তু কান দিয়ে শোনা যায়। বোধ করার জন্য যা কানের বিষয়, মানুষ তাকে চোখের বিষয় করে ফেলেছে। আর যা কোনো ইন্দ্রিয়ের নয়, অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়াতীত তার বোধ করানোর জন্য কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় করা যাবে বল? যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, তাকে কেবল অনুভব দ্বারাই জানা যেতে পারে। আর এ আবশ্যক নয় যে, নিরাকার অক্ষরের এবং শব্দের কল্পিত চিহ্ন গড়লে তবেই বিদ্যা হবে, নইলে হবে না? যদি এমনটি হতো, তাহলে অন্ধ-বিদ্বান ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যেত না। কেননা, অন্ধ তো জীবনেও অ, আ, ই, ঈ এদের রূপ দেখেনি। তারা, এ, বি, সি, ডি ও চোখে দেখেনি, চোখ নেই তো দেখবে কেমন করে? কিন্তু তুমি দেখেছ, অন্ধব্যক্তিও এম. এ./বি.এ. পাশ করেছ, শাস্ত্রী হয়েছে। তারা ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ভাষা শিখেছে। দ্বিতীয়তঃ লিখিত এবং কল্পিত চিহ্নকে বলা হয় 'বর্ণ'। যা মুখে উচ্চারিত হয় তাকে বলা হয় 'অক্ষর'। অক্ষর নিরাকার, অক্ষরের কোনো রূপ নেই। যা লেখা যায় তাকে বর্ণ বলে। সেই বর্ণের আকার আছে,—বর্ণ সাকার।

কমলঃ আচ্ছা, যদি তাই হয়, সময় তো নিরাকার কেমন? কিন্তু সময়েরও মূর্তি সাকার ঘড়ি রূপে তৈরী হয়েছে। আর আমরা নিরাকার সময়কে ঘড়ির মধ্যে সাকার রূপে দেখছি।

বিমলঃ ঘড়ি সময়ের মূর্তি নয়। ঘড়ি সূর্যের মূর্তি। সূর্যকে দেখে যেমন সময়ের জ্ঞান হয়, তেমনি ঘড়ি দেখে সময়ের জ্ঞান হয়। ঘড়ির যাবতীয় ক্রম সূর্যের উপর নির্ভর করে।

কমলঃ নিরাকার ধ্যান যদি করতেই হয় তা করব কেমন করে? যদি চোখের সামনে কোনো মূর্তি থাকে তবেই তো তার ধ্যান সম্ভব হয়। নিরাকারের ধ্যান করতে চোখ বন্ধ করলাম, আর কোনো কিছুই দেখতে পেলাম না - এ অবস্থায় মন বসবে কেমন কেরে?

বিমলঃ শোনো, জগৎ দুই প্রকারের, আধ্যাত্মিক আর ভৌতিক। আধ্যাত্মিক জগৎ — অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধীয় বা আত্মা সম্পর্কীয় জগৎ। ভৌতিক জগৎ অর্থাৎ — পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চভূত সম্বন্ধীয় বা পঞ্চভূত সম্পর্কীয় জগৎ। মনে রাখতে হবে পরমাত্মা সম্পর্কীয় চিন্তন আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। যখন তুমি ধ্যান করতে বসেছ, তখন তোমার মাথার মধ্যে মূর্তির আকৃতি ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। এ অবস্থায়, আধাত্মিক অর্থাৎ পরমাত্মা সম্পর্কীয় চিন্তন হলো কী করে? সে চিন্তন তো ভৌতিক অর্থাৎ পঞ্চভূত সম্পর্কীয় চিন্তন। কেননা, মূর্তি পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত। আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ তখনই সম্ভব যখন জগতের সমস্ত মূর্তিমান বস্তুর ভাবনা-চিন্তা ত্যাগ করে আত্মাতেই

পরমাত্মার ব্যাপকতার অনুভব করতে পারবে। পরমাত্মায় এবং আত্মায় দেশকালের দূরত্ব বা ব্যবধান নেই আছে কেবল জ্ঞানের ব্যবধান। অজ্ঞানতার আবরণ দূর হলেই পরমাত্মার অনুভূতি হতে থাকবে।

বাকী রইল মন বসার কথা। মনকে বসালে সে বসে, না বসালে সে কেমন করে বসবে? জগতে অভ্যাসের দ্বারাই সমস্ত কর্ম সিদ্ধ হয়। এমন অনেক মেয়ে মানুষ আছে, যারা মাথায় পর পর দুটো তিনটে কলস রেখে কোমরে ছেলে নিয়ে, পরস্পর গল্পগুজব করতে করতে উঁচু-নীচু পথের উপর দিয়ে চলে, সাধ্য কী যে মাথার কলসী থেকে এক ফোঁটা জল মাটিতে পড়ে ! পথে ঘাটে যারা বাঁশবাজীর খেলা দেখায়, তারা মাথার উপর পর-পর কয়েকটা কলস, আর দুই কাঁধে দু-দুটো ছেলে নিয়ে লম্বা বাঁশের উপর সর-সর করে উঠে যায়। সার্কাসে মেয়েরা তারের উপর সাইকেল চালায় এসব তো অভ্যাসের পরিণাম।

রোগা-পটকা মানুষ ভোর চারটের সময় উঠে শীতের দিনে গঙ্গা বা যমুনায় স্নান করতে চলেছে, আর ঠিক সেই সময় মোটা মোটা, তাগড়া-তাগড়া মানুষ লেপের ভিতর থেকে মুখ বার করতে ভয় পায় কেনো? যারা ভোরে স্নান করার অভ্যাস করেছে, তাদের পক্ষে শীত-গ্রীষ্ম সবই সমান। এইভাবে যে ঈশ্বরের চিন্তন করার অভ্যাস করেছে, সে যম, নিয়ম সাধনা দ্বারা ঘন্টার পর ঘন্টা নদী, পাহাড়ে একান্ত স্থানে বসে বসে চিন্তন করতে সক্ষম। আর যারা সমাধিস্থ হয় তারা একই আসনে কয়েকদিন ধরে ধ্যান করতেই থাকে। তারা কি কোনো মূর্তির ধ্যান করে বলতে

পারো? একটুখানি গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝবে মূর্তিতে তো মনই বসে না কেননা, মন কখনও নাকের চিন্তন করবে, কখনও বা হাত পায়ের। মূর্তির সারা অঙ্গে মন ঘুরে বেড়াবে যখন মনের সামনে কোনো মূর্তি থাকবে না তখনই তার বৃত্তি সমূহ আত্মার অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকবে।

কমলঃ ময়রার দোকান হতে চার আনার সন্দেশ কিনে আনলাম। সন্দেশ খেয়ে সত্যি খুবই আস্বাদ পেলাম। সন্দেশ সাকার, আর আস্বাদ নিরাকার। যদি ময়রাকে বলা যায় — আমার চার আনার নিরাকার আস্বাদ দাও তো। সে কেমন করে দেবে এ থেকে বুঝলাম যে, সাকার মূর্তি হতেই নিরাকার পরমাত্মার আস্বাদ বা আনন্দ পাওয়া সম্ভব।

বিমলঃ ভাইটি শোনো। যার যা গুণ, খেলে পরে তা জানা যাবেই। সন্দেশ খেলে সন্দেশের আস্বাদ পাওয়া যাবে, জিলিপী খেলে জিলিপীর আস্বাদ পাওয়া যাবে। সন্দেশ এবং আস্বাদে গুণ ও গুণীর সম্বন্ধ আছে, ব্যাপ্য ব্যাপকের নেই। সন্দেশ দ্রব্য, আস্বাদে গুণ ও গুণীর সম্বন্ধ আছে, ব্যাপ্য ব্যাপকের নেই। সন্দেশ দ্রব্য, আস্বাদ তার গুণ। কিন্তু মূর্তি এবং পরমাত্মা দু'জনেই যে দ্রব্য। সন্দেশ খেলে গুণ আস্বাদ, অনুভব করবে। কিন্তু মূর্তি দ্বারা পরমাত্মার আনন্দ কেমন করে অনুভব করলে বলো? কেননা, পরমাত্মা তো মূর্তির গুণ নয়। আর এক কথা, সন্দেশ খেলে সন্দেশের আস্বাদ পাওয়া যায়, কিন্তু যদি কেউ মাটির নকল সন্দেশ তৈরী করে খাওয়া আরম্ভ করে, তা হলে কি সন্দেশের আস্বাদ পাবে? কোনো মতেই নয়। ঠিক্ তেমনি, পরমাত্মার অনুভূতি হলেই পরমাত্মার আনন্দ লাভ

করে, পরমাত্মার পরিবর্তে যদি কেউ মাটি বা পাথরের নকল পরমাত্মার মূর্তি তৈরী করে, তাহলে সে তাতে পরমাত্মার আনন্দ কেমন করে অনুভব করবে?

কমলঃ মূর্তি থাকায়, যেমন — নোটের এবং টাকা পয়সার ব্যবহার সুখদায়ক তেমনি মূর্তির পূজাও সুখদায়ক।

বিমলঃ ■ প্রথমতঃ — রাজা শরীরধারী, তাই তার মূর্তি ছাপ নোট এবং টাকা পয়সা তৈরী হতে পারে, কিন্তু পরমাত্মা যিনি নিরাকার তাঁর মূর্তি তৈরী হবে কেমন করে?

■ দ্বিতীয়তঃ — নোট এবং টাকা পয়সা রাজার আদেশ, রাজকীয় ট্যাকশালে তৈরী বলে সুখদায়ক। কিন্তু যদি কোনো মানুষ রাজকীয় বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজের ঘরে জাল মুদ্রা তৈরী করা আরম্ভ করে, তাহলে রাজা তাকে জেলখানা দর্শন করিয়ে ছাড়বে। সেইরূপ পারমাত্মাকে তৈরী করা এবং তার মূর্তি পূজা করা অনেক যোনিরূপ জেলখানা দর্শনের প্রয়াস ছাড়া কিছুই নয় জানবে।

কমলঃ মহাভারতে পড়েছি—একলব্য দ্রোণাচার্যের মূর্তি গড়ে শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করেছিল।

বিমলঃ দ্রোণাচার্য সশরীর, মূর্তিমান ছিলেন, তাই একলব্য তাঁর মূর্তি নির্মাণ করেছিল। সে তো ঈশ্বরের স্থানে তাঁর পূজা করেনি। তাছাড়া—সেই মূর্তিটি একলব্যকে শাস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিল একথা যদি সত্য হয়,

তাহলে একলব্যের শস্ত্র সঞ্চলন অভ্যাস করার প্রয়োজন কী ছিল? মনে রেখো একলব্য সমস্ত শাস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস দ্বারাই শিক্ষা করেছিল। শিক্ষার কথা দ্রোণাচার্য জানতেনই না। যখন তিনি জানতে পারলেন তখান তার পরিণাম একলব্যকে ভোগ করতে হয়েছিল তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে দিয়ে। কোনো কর্ম বা শিক্ষাদানের যোগ্যতা মূর্তিতে আসবে কোথা হতে? যদি মূর্তিতে শিক্ষাদানের যোগ্যতা থাকে তাহলে সকলের উচিত, ব্যাসের মূর্তি গড়ে তার কাছে বেদ পড়া।

একজন বেয়ারা কোনো ইংরাজের কাছে চাকরী করতে করতে ইংরেজী বলতে শিখে ফেলে। ময়রার কাছে চাকরী করতে করতে মানুষ মিষ্টি করতে শিখে ফেলে। আগুনের কাছে বসলে উষ্ণতা বোধ হবে। যার সঙ্গতি করা যাবে তার গুণ সঙ্গতিকারীর উপর প্রভাব বিস্তার করবে জড় মূর্তির সঙ্গতিতে জড়তা এলো, পিটনী খেলো, মন্দির ভাঙলো, দেশে ভয়াবহ পরাধীনতা ও দারিদ্র্য দেখা দিলো। জড়ের সঙ্গতিতে আত্মবিশ্বাস এবং কর্মশক্তিও হয়ে গেল।

কমলঃ এ বিষয়ে তো বিস্তার আলোচনা করা হলো। এবার আর এক কথার উত্তর দাওতো দেখি। ঈশ্বর কি দয়ালু এবং ন্যায়কারী, না ও দুটোর কোনটাই নয়? তিনি ন্যায়কারী হলে দয়া এবং ন্যায় উভয়ে এক সঙ্গে কেমন করে সেই ঈশ্বরে থাকবে কেননা, যখন তিনি দয়া করবেন তখন তাঁর ন্যায়কারিত্ব থাকবে না অর্থাৎ তিনি ন্যায়কারী হলে, দয়া এবং ন্যায় উভয়ে একসঙ্গে কেমন করে ঈশ্বরে থাকবে? কেননা, যখন তিনি

দয়া করবেন তখন তাঁর ন্যায়কারিতা নষ্ট হয়ে যাবে, আর ন্যায় করলে তাঁর দয়ালুতা থাকবে না।

বিমলঃ ঈশ্বরের দয়া ও ন্যায় এ দুটো গুণ যুগপৎ কেমন করে এক আধারে থাকতে পারে — এ বিষয়ে আগামীকাল বিবেচনা করা যাবে। কেমন?

ঈশ্বর ন্যায়কারী অথবা দয়ালু

(ষষ্ঠ দিন)

বিমলঃ তোমার কালকের প্রশ্নঃ "ঈশ্বরের দয়া ও ন্যায় এই দুটো গুণ যুগপৎ কেমন করে থাকতে পারে? তাই না?"

তবে শোনো, **বাস্তবিকপক্ষে দয়া এবং ন্যায় এ দুটোই এক সঙ্গে থাকা সম্ভব দুটোয় কেবল এইমাত্র তফাৎ এই যে, দয়ালু ঈশ্বর 'দয়া' নিজের দিক থেকে আর 'ন্যায়', জীবের কর্মের দিক থেকে করে থাকেন।** কৃষক জমিতে বীজ ছাড়লে, ঈশ্বর একটা দানার পরিবর্তে শত শত বীজ দিলেন,— এটা তাঁর দয়া। এবার শোনো তাঁর 'ন্যায় কী রকম। যে যেমন বীজ ছড়ায় সে তেমন ফসল কাটে। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল ভোগ করবে। ধান ছড়িয়ে চাষী গম পাবে কেমন করে? ধান ছড়িয়ে সে ধানই পাবে,— গম পাবে না। এই হল ঈশ্বরের 'ন্যায়'।

এক পিতার চারটি ছেলে। তিনি চার ছেলেকে এক হাজার করে টাকা দিলেন। এ হলো তার ছেলেদের প্রতি পিতার 'দয়া'। কিন্তু যদি ছেলেদের কেউ তাঁর অন্য ছেলের কাছ থেকে জোর করে টাকা কেড়ে নেয়, তাহলে যে ছেলেটি অন্যের কাছ থেকে টাকা কেড়ে নিয়েছিল, পিতা সেই ছেলেটিকে দণ্ড দিবেন,—এটা তাঁর 'ন্যায়'। টাকা দেওয়াটা পিতার

নিজের দিক থেকে। তাই সেটা ‘দয়া’ আর দুষ্ট ছেলেকে দণ্ড দিয়ে টাকার অধিকারীকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া - এটা হলো পিতার “ন্যায়”।

এক রাজা ডাকাতকে প্রাণ-দণ্ড দিলেন। এটা তাঁর ‘ন্যায়’, ডাকাতের প্রাণ-দণ্ড দিয়ে পীড়িত প্রজার জীবন রক্ষা করা রাজার ‘দয়া’। রাজা যদি ডাকাতকে ছেড়ে দেন তাহলে ছেড়ে দেওয়াটা হবে ‘অন্যায়’। বাস্তবিক পক্ষে ‘দয়া’ যে উদ্দেশ্যে, ‘ন্যায়’ ও সেই উদ্দেশ্যেই। যেখানে ‘ন্যায়’ নেই, সেখানে ‘দয়া’ নেই। অন্যায়কারী কি কখনও দয়ালু হতে পারে ? পরমাত্মা ন্যায়কারী বলেই তিনি জীবের কল্যাণার্থে সৃষ্টি রচনা করেছেন, এ তাঁর পরিপূর্ণ ‘দয়া’। কর্মানুসারে তিনি প্রত্যেক প্রাণীকে ফল দিচ্ছেন এ তাঁর ‘ন্যায়।

কমলঃ মানুষ যদি কোন অন্যায় কাজ করে ঈশ্বর তা জানতে পারেন কিনা? জানলে সে সময় তিনি বাধা দেন না কেনো?

বিমলঃ পরমেশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে অসৎ কর্ম হতে তৎকালেই নিবৃত্ত করেন। এর প্রমাণ — মানুষ যখন অসৎ কর্ম করতে প্রবৃত্ত হয়, সে সময় তার অন্তঃকরণে তৎকালই ভয়, লজ্জা, শঙ্কার ভাব উৎপন্ন হয় আর সৎকর্ম করলে হৃদয়ে তৎকালেই আনন্দ, উৎসাহ উৎপন্ন হয়। এ সমস্ত পরমাত্মার দিক থেকেই হয়ে থাকে। এরই নাম অন্তরের ডাক। কেবল মানুষই নয়, পশু পাখীর অন্তরেও অসৎ কর্ম করলে ভয়, লজ্জা, শঙ্কা উৎপন্ন হয়ে থাকে। কুকুরকে যখন রুটির টুকরো দেওয়া হয়, তখন সে

সেই স্থানেই রুটির টুকরোটা আনন্দে খায়, আর লেজ নাড়তে থাকে। আবার সেই কুকুরই যখন চুরি করে পালায়, তখন সে লেজ নাড়ে না, মনের সাধে খায় না অধিকন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে আড়াল করে খায় কেনো? না, সে জানে এটা পাপ, চুরি। এ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, ঈশ্বর প্রত্যেক জীবকে অসৎ কর্ম হতে তৎকালই প্রতিনিবৃত্ত করে থাকেন।

হ্যাঁ, আর একথাও অবশ্যই সত্যি যে, ঈশ্বর কোনো জীবের কাছ থেকে তার স্বাধীনভাবে কর্ম করার অধিকার কেড়েও নেন না। স্বতন্ত্রতা কাড়বেনই বা কেনো? জীব যে অনাদি, তার কর্ম করার স্বাধীনতা আছে। আর এক কথা—ঈশ্বর যদি জীবের কর্ম করার স্বাধীনতা হরণ করেন তাহলে জীব, জীব থাকবে না এবং জীবের কখনও উন্নতি হবে না। যদি বলো কেমন করে? মনে কর কোনো স্কুলে ছাত্রদের পরীক্ষা হচ্ছে। অধ্যাপক সমস্ত ছাত্রের উপর দৃষ্টি রখে চলেছেন, যেন কেউ কারো নকল না করে। কয়েকটি ছাত্র প্রশ্নের ভুল উত্তরও লিখছে। অধ্যাপক তাদের লিখিত ভুল উত্তরও দেখছেন। কিন্তু তিনি সে সময় ছাত্রদের ভুল লিখতে নিষেধও করছেন না, লিখতেও দিচ্ছেন, তিনি তাদের স্বাধীনতায় বাধা দিচ্ছেন না। অধ্যাপক যদি সমস্ত ছেলেদের খাতায় নিজেই প্রশ্নের উত্তর লিখে দেন, তাহলে ছেলেদের ব্যক্তিগত উন্নতি হতে পারবে কি? ছাত্রকে পড়িয়ে তাঁর পরীক্ষা নেওয়ার অর্থই বা কোথায় থাকবে? এই অবস্থায় সেই ছাত্ররা, ছাত্রই থাকবে না, সে কলের যন্ত্রের মত হয়ে যাবে। অধ্যাপকের কাজ ছাত্রদের পাঠ্য বিষয়ের পরিজ্ঞান করানো। আর

ছাত্রদের কাজ পরিজ্ঞাত বিষয়ের যথাযথ উত্তর দান। ঠিক্ তেমনি ঈশ্বরের কাজ হলো, মানুষকে বেদজ্ঞান দিয়ে বিধিনিষেধের এবং ভাল মন্দ কর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা। জীব স্বতন্ত্রতা পূর্বক তন্নির্দিষ্ট কর্মের অনুশীলন করবে। যদি জ্ঞানানুকূল কর্ম করে তাহলে সে সুখলাভ করবে, আর যদি জ্ঞানের প্রতিকূল কর্ম করে তাহলে সে দুঃখভোগ করবে। বেদ জ্ঞানের ভাণ্ডার। প্রত্যেক প্রাণীর অন্তঃকরণেও নিষিদ্ধকর্ম না করার, প্রেরণার প্রতি মন দেওয়া, বা–না দেওয়া, এ প্রাণীর নিজের ব্যাপার। একেই বলে ঈশ্বরের মন্দকর্ম হতে জীবকে প্রতিনিবৃত্ত করা, জীবের কর্ম করার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া বা হরণ করা নয়।

কমলঃ আচ্ছা, ঈশ্বর হাতে-হাতে কর্মের কর্ম-ফল দেন না কেনো?

বিমলঃ প্রত্যেক কর্মের ফল হাতে-হাতে দেওয়া কি সম্ভব হতে পারে? কল্পনা কর : — ঈশ্বর কোনো ব্যক্তির কর্মে প্রসন্ন হয়ে তাকে হাতে-হাতে ফল দিয়ে দিলেন — তুমি এক বৎসর কাল আনন্দ ভোগ করবে। এবার দ্বিতীয় দিন সেই অসৎ কর্ম করে বসল — ঈশ্বর তাকে সেই অসৎ কর্মে ফলস্বরূপ এক বৎসর দুঃখভোগ করার আদেশ দিলেন। এবার ভেবে দ্যাখো, যে ব্যক্তিটি ঈশ্বরের বিধান মতে এক বৎসর কাল আনন্দ ভোগ করল এটা তার প্রথম শুভ কর্মের ফল। ঈশ্বরের নিয়ম পূর্ণ হয়ে গেল, কেমন? এবার উত্তর সুখভোগ বৎসরকালের মধ্যে সে যত ইচ্ছা অসৎ কর্ম করুক তার ফল, সুখভোগ বৎসর কালে পাওয়া উচিত নয়। যদি এই বৎসরেই অসৎকর্মের ফল লাভ করে, তাহলে প্রথম বৎসরের শুভকর্মের

ফল যে একবৎসর কাল ভোগ করছিল, ঈশ্বরের সেই পূর্ব আদেশ ভঙ্গ হয়ে গেল। জীব যখন কর্ম করায় স্বাধীন তখন সে ভাল-মন্দ শুভ-অশুভ উভয় প্রকার কর্ম করবে। ঈশ্বর যদি সকলকে তৎকাল ফল দিতে থাকেন, তাহলে না হবে অশুভ কর্মের ফলভোগ ব্যবস্থা, আর না হবে শুভ কর্মের ফলভোগ ব্যবস্থা। এ অবস্থায় কোনো কর্মের ফলভোগ ব্যবস্থার কাল পূর্ণ হতে পারবে না। এই কারণ ঈশ্বর প্রত্যেক কর্মের ফল তাঁর নিয়মিত ব্যবস্থা অনুসারেই দিয়ে থাকেন।

কমলঃ এই জগতে, যে সমস্ত লক্ষলক্ষ যোনি আছে, তারা কি সকলে কর্মফল স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন যোনি লাভ করেছে?

বিমলঃ জগতে দুই প্রকার যোনি আছে। "ভোগ যোনি" এবং "উভয় যোনি" এই সব জীব তাদের নিজ নিজ কর্মানুসারের যোনি লাভ করেছে।

কমলঃ 'ভোগ যোনি' আর 'উভয় যোনি' মানে কী?

বিমলঃ জীব যে যোনি লাভ করে সুখ-দুঃখ ভোগ করে, তাকে বলে "ভোগ যোনি" অর্থাৎ সে ভাবিকালের জন্য কোনো কর্ম করতে অক্ষম। যথা—পশু, পক্ষী প্রভৃতি। মনুষ্য যোনিকে বলে 'উভয় যোনি'। এতে মানুষ সুখ-দুঃখ রূপ ফল ভোগও করে এবং ভাবিকালের জন্য ভাল মন্দ কর্মও করে।

কমলঃ মনুষ্য যোনিকে কেনো 'উভয় যোনি' বলে স্বীকার করা হয়ে থাকে?

বিমলঃ পশু পাখীরা কেবল খাওয়ার চিন্তা করে থাকে, পদার্থ উৎপন্ন করার চিন্তা তাদের থাকে না। তাদের জন্ম ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুসারে কেবলমাত্র কর্মফল ভোগ করার জন্য হয়, উপার্জনের জন্য হয় না।

দ্যাখো- ধান, যব, গম প্রভৃতি শস্য সমস্ত পশু পাখী খায়, কিন্তু তারা শস্য উৎপন্ন করতে পারে না। কেননা, তাদের মধ্যে বিচার বিবেচনা করার শক্তি নেই। কিন্তু মানুষ নিজের বিবেচনা করার শক্তি বলে পশুদের সাহায্যে ফসল উৎপন্ন করে। 'বিচার শক্তি' থাকায় মনুষ্য যোনিকে 'উভয় যোনি' বলা হয়। মানুষ পদার্থ ভোগও করে আবার পদার্থ উৎপন্ন করে। নিজের বিচারশক্তির সাহায্যে মানুষ সমস্ত পশু ও পক্ষীকুলকে নিজের আয়ত্তে করে রাখে।

এক মেষ পালকের অধীনে সহস্র মেষ থাকে। এক গোয়ালার অধীনে সহস্র সহস্র গাভী থাকে। মানুষ হিংস্র এবং বড় বড় ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসু পশুদের সার্কাসের ঘরে ভেল্কী দেখাতে রাখে। কেবল পশুই বা কেনো, মানুষ আপন বিচার শক্তির প্রভাবে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি তত্ত্ব হতেও ইচ্ছা মত কাজ করিয়ে নেয়। ঈশ্বর মানুষকে পাখীর মত ডানা দেন নাই সত্য, কিন্তু তারা উড়োজাহাজ তৈরী করে পাখীর মত আকাশে উড়ে বেড়ায়। জলে বিচরণ করার জন্য মাছ বা কচ্ছপের মত শারীরিক সাধন ভগবান মানুষকে দেন নাই, কিন্তু মানুষ জলে যাতায়াতের জন্য জাহাজ তৈরী করে জলচরের মত জলে বিচরণ করে। শকুন বা গরুড় পাখীর মত দূরের বস্তু দেখার জন্য ভগবান মানুষকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি দেন

নাই ঠিক, কিন্তু মানুষ দূরবীণ ও অনুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করে বহুদূরের বস্তু দেখে এবং অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম জীবাণুকেও দেখে। বাস্তবিক কথা এই যে, মানুষের মধ্যে বিচার শক্তি আছে, তাই মানুষ 'উভয় যোনি'। এরা পূর্ব জন্মের কর্মফল ভোগ করে, আর ভাবিকালের জন্য কর্মও করে।

কমলঃ জীব যত প্রকার যোনি লাভ করে থাকে, সব কি কর্মানুসারেই লাভ করে? মানুষ কি পশু, পক্ষী প্রভৃতি যোনিতেও যায়?

বিমলঃ হ্যাঁ, জীব আপন আপন কর্মানুসারে নানা প্রকার যোনি লাভ করে এবং সেই সব যোনিতে যাওয়া-আসাও করে। মনুষ্য যোনি পাপ-পুণ্য রূপ কৃতকর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। কেননা আমি পূর্বেই বলেছি যে, মানুষের মধ্যে বিচার শক্তি আছে। মানুষ যখন তার বিচার শক্তির অপপ্রয়োগ করে, তখন সে পাপী হয়ে বহু যোনিতে ভ্রমণ করতে থাকে। ঈশ্বর তাঁর ন্যায় ব্যবস্থানুসারে প্রত্যেক জীবকে অপকর্মের শোধনার্থে বিভিন্ন যোনিতে পাঠিয়ে থাকেন। মানুষ যা কিছু ভালমন্দ কর্ম করে, সেই ভাল-মন্দ সংস্কার তাকে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যোনিতে নিয়ে যায়।

কমলঃ মনুষ্য যোনি কেমন করে লাভ করা যায় আর মুক্তিই বা কেমন করে হয়?

বিমলঃ যখন পাপের চেয়ে পুণ্যের সংস্কার উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় তখন মানুষের মনুষ্য যোনি লাভ হয়। আর যখন কর্ম-সংস্কার প্রবল হয় এবং জ্ঞান লাভ হয়, তারপর মরণোত্তম যে অবস্থা উপলব্ধ হয়, তাকে মুক্তি

বলে। এক কথায় বলতে হলে — জীব সাংসারিক দুঃখ হতে নিষ্কৃতি লাভ করে পরমানন্দ লাভ করে।

কমলঃ হাতির জীব পিঁপড়ের মধ্যে কেমন করে প্রবেশ করে? কেননা বড় শরীরের জন্য বড় এবং ছোট জীবের জন্য ছোট জীব আছে হয়ত।

বিমলঃ জীব ছোট বড় হয় না, সমস্ত প্রাণীতে একই রকম জীব থাকে। শরীর ছোট বড় হয়, তাতে ভিন্নতা দেখা যায়, জীব ছোট বড় হয় না। যথা — একই ইঞ্জিনে অনেক প্রকারের যন্ত্র জোড়া থাকে, কোনো যন্ত্র কাটার কাজ করে, কোনোটা কেটে ছোট বড় করে, কোনোটা মাপে, ইঞ্জিন সবাইকে একই প্রকার শক্তি দিচ্ছে কিন্তু যন্ত্রের অংশ বিশেষ ছোট বড় হওয়ায় কাজ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হচ্ছে। দ্যাখো, যারা মানুষের মত অধর-ওষ্ঠ পেয়েছে তারা দুধ চুষছে, যে প্রাণী চঞ্চু পেয়েছে তারা ঠোকর মারছে। একজন ক্রীড়াবিদ সে যদি মোরগের মত পালক যুক্ত পোষাক পরে নকল ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মারতে পারে, সে অবস্থায় জীবে ভেদ কোথায় রইল?

কমলঃ জন্ম কি কর্মানুসারে হয়? যদি তাই হয়, তাহলে জন্মের পূর্বের কর্ম কোথা হতে এল? শরীর ছাড়া যখন কর্ম করা যায় না, আর জীবের সঙ্গে যখন পূর্বে কোনো শরীরই ছিল না, সে অবস্থায় সে কর্মটা করল কখন? তাছাড়া সে শারীরিক বন্ধনে বদ্ধ হলো কেমন করে?

বিমলঃ জন্ম তো অজ্ঞানতা হতে হয়ে থাকে, আর যোনি কমানুসারে পাওয়া যায়। যথা— ছেলে প্রথম স্কুলে প্রবেশ করে, সে প্রবেশ তার অজ্ঞানতার কারণ। ধীরে ধীরে শ্রেণীতে উন্নয়ন তার কর্ম ও যোগ্যতার আধারে হয়ে থাকে। ঠিক্ তেমনি জগৎরূপী স্কুলে জীবের প্রবেশ অর্থাৎ শরীর ধারণ করা অজ্ঞানতার কারণ। বহু শ্রেণী সমূহ অতিক্রম করা অর্থাৎ বিভিন্ন যোনি অতিক্রম করা, কর্মানুসারেই হয়। আর এক কথা, জীবের একটাই জন্ম হয় না, অনন্তবার শরীরের সঙ্গে জীবের সংযোগ হয় এবং হতে থাকে। বহু জন্মের কর্ম আত্মায় সঞ্চিত থাকে। যদি বলো সৃষ্টির আদিতে কোন্ কর্ম সংস্কার ছিল? এর উত্তর এই যে, সৃষ্টির আদিতে এবং তারও পূর্ব সৃষ্টির কর্ম-সংস্কার সঞ্চিত ছিল। সৃষ্টি প্রবাহতঃ অনাদি, দিন আর রাত্রির মত নিরন্তর এই চক্র চলেই আসছে আর এইভাবে চলেও আসবে।

ভূত প্রেত কী বস্তু?

কমলঃ ভূত যোনি বলে কোনো যোনি আছে নাকি? মানুষ ভূত-প্রেতের মস্ত মস্ত গল্প শোনায়। ভূতের ওঝা আর মিয়া — মৌলবী মাদুলী ধারণ করায়, ঝাড়-ফুঁক করে, ভূত নামায় এসব কথা কি সত্যি?

বিমলঃ ভূত প্রেতের কোনো অস্তিত্ব নেই। লোকে যে সব গল্প শোনায় ওসব মন-গড়া কথা। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এগুলি সময়ভেদের সংজ্ঞা মাত্র।

ভূত মানে—যা হয়ে গেছে, অর্থাৎ অতীত। যখন কোনো মানুষ দেহ ত্যাগ করে তখন তার অস্তিত্ব বর্তমান না থাকায় তাকে 'ভূত' বলা হয়। অর্থাৎ প্রাণহীন শরীরে আত্মার অস্তিত্ব নেই। এ এখন অতীতের কথা হয়েছে। আর 'প্রেত' বলেও কোন বস্তু নেই। যত লোক ভূত-প্রেত দেখার কথা বলে থাকে তারা সব অন্ধকারেই দেখে থাকে। যত অসত্য সে সব অন্ধকারেই হয়ে থাকে। জগতের সূক্ষ্ম এবং স্থুলবস্তু সমূহ, হয় ইন্দ্রিয়ের, না হয় যন্ত্রের সাহায্যে সকল সময় দেখা সম্ভব হবে। যদি ভূত-প্রেত বলে কোন যোনি থাকে, তাহলে সেই যোনিও অবশ্যই দেখা যেতো। কিন্তু তা তো দেখা যায় না। যার মনে ভ্রম এবং ভয় থাকে, অথবা যার মনে ভুত-প্রেতের সংস্কার পড়ে থাকে, তাদের তারাই দেখতে পায় অন্য লোকে দেখতে পায় না। মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত— "মনের উপর যেমন সংস্কার

পড়ে থাকবে, ভয়ার্ত হলে অথবা মানসিক ব্যাধির অবস্থায় সে সেইরূপ ছবি দেখতে পাবে।" ভাববার কথা এই যে, মানুষ যখন শরীর ত্যাগ করে, তারপর তার শরীর পঞ্চভূতে মিশে যায়। যদি তাই হয়, তাহলে ভূতই বা কেমন, আর প্রেতই বা কেমন কে জানে!

যদি জীবাত্মা বা সূক্ষ্ম শরীরকে ভূত-প্রেত বলা হয়, তাহলে সেই ভূত নামক জীবাত্মাটি স্থুল শরীর ছাড়া কিছুই দেখতে বা শুনতে পাবে না এবং শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোনো কাজও সে করতে পারবে না সূক্ষ্ম শরীরেরও এই একই দশা।

বাকী রইল মাদুলী–তাবিজ বাঁধা, ঝাড়ফুঁক করা আর ভূত-প্রেত নামাবার কথা। এসব ভণ্ডামী। মাদুলী, তাবিজ বাঁধলে আর ঝাড়ফুঁক করলে যদি রোগ সেরে যেতো, তাহলে যাঁরা তাবিজ-মাদুলী দেয় আর ঝাড়ফুঁক করে, সেই সব ওঝাদের ছেলেদের কোনো দিন রোগও হতো না, আর তারা মরতও না। কিন্তু দেখা যায় তাদের ছেলেও মরে, কালে — সেও মরে। যদি ঝাড়ফুঁক করলে কাজ হতো তাহলে ডাক্তার বৈদ্যর প্রয়োজন কী ছিল? কারো উপর ভূত-প্রেত বা দেব-দেবীর ভর করার মুখোশ খুলতে দেরি লাগে না। একবার ঝাড়ফুঁককারীদের কঠিন প্রশ্ন করে দেখুন। যারা এ বিষয়ের পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক তাদের উচিত, যাদের উপরে হিন্দু দেব-দেবী ভর করেছে তাদের কোনো বেদমন্ত্রের অর্থ জিজ্ঞাসা করা। আর যদি কোনো ইসলামী জিন, সৈয়দ পীর কারো উপর ভর করে, তাদের 'কুরান' শরীফের আয়াত শোনাবার কথা বলা উচিত।

এরূপ করলে তাদের সব ভণ্ডামী এবং ওজর আপত্তি ধরা পড়ে যাবে। সাধারণতঃ এ বিষয়ের চালাক চতুর মানুষ এমন কতকগুলো শব্দ শোনাতে থাকে যার অর্থ লোকে কিছুই বুঝতে পারে না, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী মনে করে এবার ওঝা ভূতকে বশে এনে ফেলেছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভূত-প্রেত বলে কিছুই নেই। এ একেবারে ভ্রম। এই ভ্রমই অজ্ঞানী এবং অন্ধবিশ্বাসী মানুষকে বিপাকে ফেলে। প্রত্যেক মানুষের এ বিষয়ে বিশ্বাস থাকা উচিত যে, কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। তাকে কেউ টলাতে পারবে না। ন্যায়কারী পরমাত্মা সদা সর্বদা বিরাজমান। জগতের এমন কোনো দ্বিতীয় শক্তি নেই যে, কর্ম ব্যতীত বা পূর্ব জন্মের সংস্কার ছাড়া ঈশ্বরের ন্যায়-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কেউ কাউকে তাদের ইচ্ছামত ভাল, আর কাউকে মন্দ ফল দিতে পারে।

সুখ দুঃখ কি গ্রহের ফেরে হয়?

কমলঃ আচ্ছা, ভূত-প্রেত যোনি না হয় নেই, কিন্তু গ্রহের ফেরে যে সুখ দুঃখ হতে দেখা যায় একথা তো স্বীকার করবে? নবগ্রহের ফল তো ভোগ করতে হয়ই । গণক ঠাকুরদের কথা তো মিথ্যা হবার নয় । জ্যোতিষ বিদ্যা তো বহু মাস এবং বহু বৎসর পূর্বেই ভাবী সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের কথা সত্যি সত্যি বলে দিতে পারে।

বিমলঃ দ্যাখো, সুখ-দুঃখ গ্রহের ফেরে হয় না, এ সব আপন আপন কর্মফলের উপর নির্ভর করে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত গ্রহ আছে তারা কাউকে দুঃখ দেয় না, সমস্ত গ্রহের প্রভাব পৃথিবীর উপর পড়ে একথা সত্য কিন্তু তাদের প্রভাবে জীবের সুখ-দুঃখ প্রাপ্তি হয় একথা সত্য নয়। বস্তু বিশেষে যে পরিবর্তন দেখা যায় তা সেই সমস্ত বস্তুর আপন অবস্থার কারণে হয়। যেমন নাকি, সূর্য একটা জ্যোতিষ্ক, তার আলো সর্বত্র পড়েছে । একটি গাছ পৃথিবীর বুকে লাগান হয়েছে, পাশেই আর একটি গাছ কাটা পড়ে আছে। সূর্যের কিরণ ঐ দুই গাছের উপর পড়ছে। যে গাছটা কাটা পড়ে আছে সে শুকিয়ে যাচ্ছে, আর যে গাছটা মাটির বুকে শেকড় ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে বেড়েই চলেছে।

সূর্যের আলো যখন দুটো গাছের উপরই সমানভাবে পড়ছে এই অবস্থায় একজন শুকিয়ে যাচ্ছে আর একজন বেড়ে চলেছে – কেনো? সেই একই

সূর্যের আলো পাথরের উপর পড়ছে, আবার সেই আলো পড়ছে বরফের উপর, কিন্তু পাথরের উপর সূর্যের আলো পড়ে পাথরে আসছে কাঠিন্য, আর বরফ গলে জল হয়ে যাচ্ছে। সেই একই সূর্যের আলোয় নির্দোষ চক্ষুষ্মান মনোরম দৃশ্য দেখে আনন্দ বিভোর, আর যার চোখ উঠেছে তাকে সেই সূর্যের আলো ব্যথিত করে তুলছে। এবার বলতো সূর্য এদের কোন্ ক্ষতিটি করেছে? এতে সূর্যের দোষ কোথায়? যে বস্তুর যে স্থিতি তদনুসারে তাদের মধ্যে পরিবর্তন এবং লাভ ক্ষতি হচ্ছে।

দ্যাখো! জ্যোতিষের দু'টি অঙ্গ স্বীকৃত— গণিত এবং ফলিত। যে পর্যন্ত গণিতের সম্বন্ধ, ততদুর ফলিত সত্য, আর ফলিত অনুমানের বস্তু বলে মিথ্যা। সূর্য গ্রহণ এবং চন্দ্র গ্রহণ গণিতের উপর আশ্রিত, তাই গ্রহণের দিনক্ষণ দু'চার মাস পূর্বে কেনো, কয়েক বছর পূর্বেও বলা যায়। সৃষ্টির আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত সূর্য প্রভৃতি গ্রহগণ আপন আপন কর্মে নিযুক্ত থাকবে এই জন্য তাদের গণনা প্রমাণিত।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞাতা গ্রহের গতিবিধি জানেন। তিনি পরিষ্কার জানেন যে, অমুক সময় চন্দ্রমার ছায়া সূর্যে এবং পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়বে। অতএব অমুক সময় কোন গ্রহণ হবে তা তিনি বলতে পারেন। যে বস্তু নিয়মে বাঁধা, তাই তাতে ধরা বাঁধা গতি আছে। ছোট্ট ছেলে, যে ঘড়ি দেখতে জানে, সে ঘড়ি দেখে তক্ষুণি বলে দেবে "বারটা বাজতে এত মিনিট দেরি আছে।" ঘড়ির কাঁটা যে কোন সংখ্যায় থাকুক না কেনো, প্রত্যেকটি লোক বলে দেবে। বারটা তখনই বাজবে যখন ঘড়ির

দুটো কাঁটা বারটার ঘরে এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। এ কী করে জানা যায় ? বাস্তবিক পক্ষে জ্যোতিষ একটা বিদ্যা। মানুষ গণিতের সঙ্গে ফলিত জুড়ে দিয়ে বদনাম করে দিয়েছে।

কমলঃ গণকঠাকুর কুষ্টি লেখেন, জন্ম লগ্ন ঠিক্ করে নবগ্রহের অবস্থান বিচার করে মন্তব্য করেন। কোন্ গ্রহের কখন সঞ্চার হয়েছে চট্ করে তার প্রভাব শুনিয়ে দেন। আমি কতবার দেখেছি, কারো উপর শনির প্রকোপ, কারো উপর রাহুর, কারো মারকেশের দশা, কারো উপর কেতুর কোপ, কোথাও দিক্‌শূল, কোথাও যোগিনী চক্র প্রভৃতির আলোচনা খুব করে যান। শুধু এই নয়, বাজার দর তেজ না মন্দা, ব্যবসায়ে লাভ হবে না হানি, গুপ্তধন প্রাপ্তি যোগ, উপার্জন, হারজিত, লটারীতে টাকা পাওয়া, মোকদ্দমায় হারজিৎ, ভূত, ভবিষ্য, বর্তমান তিনকালের কথা বলে দেন। সব কথা কি সত্য নয় বলছ?

বিমলঃ ভাইটি ! শোনো, তুমি একথা ঠিক্ জেনে রেখো যে, যত কিছু কথা শোনালে এ সব ভ্রমাত্মক। এক দল লোক ধূর্তামি করে, টাকা পয়সা উপার্জনের এক ফন্দি আবিষ্কার করেছে। ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে যে ভোগ জীবের কর্মে আছে, তা কেউ টলাতে পারবে না । আমি প্রথমেই তোমাকে বলেছি যে, গ্রহ নিজে কাহাকেও সুখ-দুঃখ দেয় না। কেননা তারা যে জড়। সুখ-দুঃখ তো কর্মানুসারে ভোগ করতে হয়।

দ্যাখো,– অন্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে গণক ঠাকুরের সংখ্যা কত বেশী এদেশে প্রত্যেক কাজের পূর্বে গ্রহ-তিথি-নক্ষত্র দ্যাখে, তা সত্ত্বেও

ভারত সবচেয়ে দীন, দরিদ্র এবং দুঃখী। অন্যান্য দেশের চেয়ে ভারতে অধিক বেকার ও অন্ন-বস্ত্রহীন ব্যক্তি দেখতে পাবে। ভারতে প্রায় আড়াই কোটি বিধবা আছে (লেখকের সময়ে)। বলতে পার কি,-এত বিধবা বিশ্বের আর কোন দেশে আছে? এদের বিবাহ পাঁজি-পুঁথি, দিন-ক্ষণ দেখেই তো দেওয়া হয়েছিল। রাশি, বর্গ, লগ্ন, মেল, যোটক সবই তো গণকঠাকুর মিলিয়ে ছিলেন, তবু এত বিধবা কোথা থেকে এলো? ব্রহ্মাপুত্র বশিষ্ঠ, তিনি গ্রহ মুহূর্ত দেখে লগ্ন স্থির করলেন যে, আগামীকাল সকাল বেলা শ্রীরামচন্দ্রকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যের ভার তাঁর হাতে দেওয়া হবে। কিন্তু কর্মের গতি অর্থাৎ ভোগ এরূপ প্রবল যে, সকাল হতেই শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে যেতে হলো। রাজা দশরথ প্রাণত্যাগ করলেন। তিন রাণীই বিধবা হলেন। সীতা বনবাস কালে অপহৃত হলো। শ্রীরামচন্দ্রকে বহু ক্লেশ সহ্য করতে হলো।

তাই সুরদাস লিখছেন—

"করম গতি টারে নাহি টরী।
গুরু বশিষ্ঠ সে পণ্ডিত জ্ঞানী,
রুচি রুচি লগ্ন ধরী।
সীতা চরণ মরণ দশরথ কো
বিপদ মে বিপত পরী।"

অর্থ - কর্মগতির পরিবর্তন হয় না। গুরু বশিষ্ট জ্ঞানী পণ্ডিত। রুচিমত লগ্ন করলেন তবু সীতার বনগমন, দশরথের মৃত্যু হল, বিপদের উপর বিপদ এসে পড়ল।

গোস্বামী তুলসীদাস লিখছেন—

"লগন মুহূর্ত্ত যোগ গ্রহ তুলসী গিণৎ ন কাহি।
শ্রীরাম ভয়ো তিহি দাহিনে সবৈ দাহিনে তাহি ।।"

গ্রহের ফের, দশা - এসব বড়ই বিচিত্র।

দ্যাখো ! যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, তার পরিধি ২৫০০০ হাজার মাইল। সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা তের লক্ষ গুণ বড়, আর ওজন ৩৩৩৪৩২ গুণ বেশী ! আমরা যদি এক ঘণ্টায় একশ মাইল গতিতে উড়ন্ত উড়োজাহাজে বসে দিবারাত্রি চলা আরম্ভ করি তাহলে পৃথিবী হতে সূর্য পর্যন্ত যেতে আমাদের ১০৫ বৎসর লাগবে। সূর্য অপেক্ষা ও বড় "বৃহস্পতি" প্রভৃতি গ্রহ আকাশে আছে। এমন বহু নক্ষত্র আছে যার আলো পৃথিবী পর্যন্ত পৌছাতে লক্ষ কোটি বৎসর লেগে যায় এবার একটু বিচার কর, যেসব নক্ষত্র এতদূরে থাকে, কারো ওপর তাদের সঞ্চর হওয়া

কি সম্ভব? তারপর মজার কথা এই যে গ্রহের সঞ্চার হলো শ্রেষ্ঠীর উপর আর অনুভব করলেন গণকঠাকুর মশাই।

কারো দেহে পিঁপড়ের সঞ্চরণ দেহী জানতে পারে, কারো উপর হাতি ঘোড়ার সঞ্চরণ দেহের অস্তিত্বই লোপাট হয়ে যায়। আর—গ্রহ, যে গ্রহ হাতি, ঘোড়া অপেক্ষা না জানি কতগুণ বড়, সেই গ্রহ ঘাড়ে চেপে বসল। যার ঘাড়ে বসল, সে মোটেই জানতে পারল না ! একি কম আশ্চর্যের কথা ? বাস্তবিক পক্ষে এ ধারণা একেবারে প্রবঞ্চকের জাল। এতে কোনো সার তত্ত্ব নেই। যা কিছু ভোগ এবং অদৃষ্ট স্থির থাকে, মানুষ তাই পায়। দিক্‌শূল প্রভৃতিও ভণ্ডামী। রেল এবং মোটরগাড়ী সমস্ত দিকশূলকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

কল্পনা করো, কলকাতায় কারো মকদ্দমা চলছে। যেদিন মকদ্দমার তারিখ সেদিন গণকঠাকুর বললেন— "আজ কোর্টে যেও না, আজ দিকশূল।" গণক ঠাকুরের কথা শুনে লোকটি যদি কোর্টে না যায়, তাহলে কি দিকশূল তার মকদ্দমার তদ্বির করবে? কোনো মতেই নয়। এক শেঠজীর বোম্বাই হতে টেলিগ্রাম এলো "তুমি অবিলম্বে এখানে চলে এসো নইলে কয়েক হাজার টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে।" শেঠজী ঘর থেকে বের হবেন এমন সময় গণকঠাকুর বললেন—"আজ দিনটি ভাল নয় শেঠজী।" দ্বিতীয় দিন ঘর থেকে বেরিয়েছে কি, এমন সময় বিড়াল রাস্তা কেটে চলে গেল। তৃতীয় দিন মোটর পর্যন্ত পৌঁছে গাড়ীতে বসবে এমন সময় 'হ্যাঁচ্ছো' চতুর্থ দিন ঘর থেকে বেরুচ্ছে এমন সময় বোম্বাই হতে

টেলিগ্রাম এলো, “আপনি না আসায় ২০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়ে গেল।” দেখলে তো, ভ্রমের কী ভয়ঙ্কর পরিণাম প্রকাশ পেলো।

যে গণকঠাকুর বাড়ীর কোন কোণে ধন পোতা আছে তার সন্ধান দিতে পারে, মনে মনে জানবে তিনি মহা-প্রবঞ্চক। পৃথিবীতে শত শত কোটি-কোটি টাকার সম্পত্তি মাটিতে পোঁতা আছে, তিনি কেনো প্রোথিত ধনভাণ্ডার মাটি হতে তুলে আনেন না? জিওলজী (Geoogy) অর্থাৎ ভূগর্ভ বিদ্যা যাঁরা জানেন তাঁরা কেনো পৃথিবীর গর্ভে কী আছে তা মাথা ঘামিয়ে খুঁড়ে বেড়ান? এই গণকঠাকুরের দলই তো পৃথিবী-গর্ভস্থিত রত্নের সন্ধান বলে দিতে পারেন। এ অবস্থায় জগতের রাষ্ট্র নায়কেরা কেনো যে ভূতাত্ত্বিকদের পিছনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেন তা বোঝা ভার। গণকঠাকুরদের জিজ্ঞাসা করলেই তো তাঁরা অনায়াসে সন্ধান দিয়ে দিতে পারেন। এতে বেশী টাকা পয়সাও খরচ হয় না, কাজও ভাল হয় এবং শীঘ্র কার্য উদ্ধার হয়। আসল কথা প্রবঞ্চনা মাত্র। অতএব কেউ যেন এসব কথায় না পড়ে, আপন কর্ম-ফল এবং ঈশ্বরের ন্যায়কারিতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে বুদ্ধি পূর্বক শুভকর্ম করে যায়,— ইহাই মনুষ্যত্ব।

কমলঃ দাদা। এবার আর এক প্রশ্নের উত্তর দাও। শ্রাদ্ধ করা উচিত না অনুচিত।

বিমলঃ এ বিষয়ে আগামীকাল বিচার বিবেচনা করা যাবে।

শ্রাদ্ধ করা উচিত না অনুচিত ?

(সপ্তম দিন)

কমলঃ দাদা ! আজ বলো শ্রাদ্ধ করা উচিত, না অনুচিত?

বিমলঃ শ্রাদ্ধ করা উচিত । শ্রাদ্ধ কাদের জন্য? জীবিত মাতা পিতা, ঠাকুরদাদা, ঠাকুমা, দাদামশাই, দিদিমা, গুরু, আচার্য তথা অন্য বৃদ্ধজন এবং তত্ত্ববেত্তা বিদ্বান ব্যক্তিদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে সেবা করা কর্তব্য, এরই নাম 'শ্রাদ্ধ' ।

কমলঃ 'শ্রাদ্ধ' তো স্বর্গবাসী পিতরগণের হয়ে থাকে, কোথাও আবার জীবিতের শ্রাদ্ধ হয় বুঝি ? এ অদ্ভুত কথা যে?

বিমলঃ প্রথমে বিচার করে দ্যাখো, 'পিতর' শব্দের অর্থ কী? 'পিতর' শব্দের অর্থ রক্ষাকর্তা। যিনি জীবিত তিনিই রক্ষা করতে পারেন। জীবিত ব্যক্তিই আপন সন্তানদের উপদেশ দিতে পারেন এবং স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা জগতের ব্যাবহারিক জ্ঞান দান করতে সক্ষম। মৃত্যুর পর তো পিতর, পিতরই থাকতে পারে না, কেননা পিতর আত্মাও নয় আর শরীরও নয়, আত্মা এবং শারীরিক সংযোগ বিশেষের নাম পিতর। যখন মৃত্যু তাদের উভয়ের সম্বন্ধ বিযুক্ত করে দেয়, সে অবস্থায় পিতরদের অস্তিত্ব রইল বা কোথায়? যদি আত্মার নাম পিতর হয় তাহলে

আত্মার নিত্যত্ব এবং অবিনাশিত্ব থাকবে না, আত্মা নাশবান হয়ে যাবে। কেননা পিতর স্বীকার করলে আত্মাতে আয়ু এবং ছোট বড় ভেদ স্বীকার করতে হবে।

■ প্রথমতঃ—আত্মার উৎপত্তি স্বীকার করতে হবে।

■ দ্বিতীয়তঃ—আত্মার উৎপত্তি যে পরবর্তী সময়ে হয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। যদি তা স্বীকার না কর, তাহলে আত্মার সহিত পিতর শব্দের সম্বন্ধ যুক্ত হবে না। যখন সম্বন্ধই যুক্ত হলো না, তো কার শ্রাদ্ধ করলে? তার পর আত্মাকে তো সবাই অবিনাশী স্বীকার করে, অতএব তাতে আয়ুর এবং ছোট বড়র ভেদই থাকবে না। বাকী রইল শরীর? শরীরকেও পিতর বলতে পারবে না।

■ প্রথমতঃ শরীর হতে আত্মার বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের 'শব' সংজ্ঞা হয়ে যায়।

■ দ্বিতীয়তঃ—যদি শরীর 'পিতর' হয়ও তাহলে সেই শরীরকে পুঁতে ফেললে বা দাহ করলে কোনো পুণ্য হবে না। অথচ মৃতক শরীরকে পুঁতে দেওয়া বা দাহ করাকে লোকে পুণ্য কাজ বলে মনে করে। বাস্তবিক পক্ষে আত্মীয়তার এবং পিতর প্রভৃতির সম্বন্ধ এই সংসারেই থাকে। দেহত্যাগের পর কে কার মাতা-পিতা, আর কে কার সন্তান। সমস্ত জীব আপন আপন কর্মফল ভোগ করার জন্য শরীর ধারণ করে জগতে আসে। শরীর ধারণ করার পর অনেকের সঙ্গে বহু সম্বন্ধ যুক্ত হয়। যদি বলো,

মৃত্যুর পরও জীবের সঙ্গে মাতা-পিতা, ভাই-বোন প্রভৃতির সম্বন্ধে থেকে যায়, তাহলে পুনর্জন্মে পুত্রের সহিত মাতার, ভাই-এর সহিত বোনের, বাবার সহিত মেয়ের বিবাহ হওয়ার দোষ লাগবে। এই কারণে মরণের পর জীবের সহিত মাতা পিতা প্রভৃতির সম্বন্ধ থাকে না। জীবিত অবস্থায় জীব এবং শরীর বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকে। অতএব শ্রাদ্ধ জীবিতেরই হয়, মৃতকের হয় না।

কমলঃ কখন, কোন কোন মাসে পিতরদের শ্রাদ্ধ করা হবে সারা বৎসরে ১৫ দিন তার জন্য স্থির করা আছে। পিতরগণ সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে, শ্রাদ্ধের সেই সেই দিন আসেন, আর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ভোজন করেন। যদি কোনো কারণ বশতঃ পিতরগণ পিতৃলোক হতে আসতে নাও পারেন, তাহলে ব্রাহ্মণদের খাওয়ানো ভোজন পিতরদের কাছে পৌঁছে যায়।

বিমলঃ আমি তো পূর্বেই বলেছি যে, পিতর—আত্মা অথবা শরীরের নাম নয়, আত্মা এবং শরীরের বিশেষ সম্বন্ধের নাম পিতর। তারপরও একথা বলা কেনো যে, পিতর সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে ভোজন করতে আসেন একথা নিতান্তই হঠকারিতা এবং অবিবেকর্তার পরিচয় দেওয়া ছাড়া আর কী হতে পরে?

আচ্ছা, না হয় তাই হলো। না হয় অল্প সময়ের জন্যে তোমার কথা মেনেই নিলাম যে, পিতর সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে এসেও থাকেন, বেশ, কিন্তু আর এক কথা - আচ্ছা বলতো, স্থুল শরীর ব্যতীত তিনি কী ভাবে ভোজন

করেন? পিতরগণ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ভোজন করার সময় প্রথমে ভোজন করেন, না, ব্রাহ্মণরা প্রথমে ভোজন করেন? প্রথমে ভোজন করলে পিতরগণ ব্রাহ্মণদের এঁটো খাবেন। আর যদি বলো যে দুজনে একই সঙ্গে খান, সে অবস্থাতেও তাঁরা পরস্পর এঁটো খাবেন। এঁটো খাওয়া স্বাস্থ্য এবং সিদ্ধান্তের দৃষ্টি দিয়ে নিতান্ত নিন্দনীয়।

আচ্ছা, পিতরদের ভোজন করানোর জন্য বছরে ১৫ দিন স্থির করা হয়েছে কেনো? সাড়ে এগার মাস তাঁদের খিদে পায় না বুঝি? তাছাড়া, ১৫ দিনের কি তাঁদের এক বছর তৃপ্তি দান করে? এ রকম হওয়া কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তাহলে কোনো লোককে ১৫দিন খাইয়ে কেউ কাউকে এক বছর বাঁচিয়ে রেখেছে দেখাও তো। ১৫ দিনই বা তাঁরা খান কোথায়? বছরের ১৫ দিনের মধ্যে মাত্র একটি দিন তাঁর আত্মীয়রা পিতরকে ভেজন করাবে বলে স্থির রেখেছে। আর এক কথা, ব্রাহ্মণদের ভোজন করালে যদি মৃতক পিতরদের কাছে ভোজন পৌঁছে যায়, তাহলে ব্রাহ্মণরা ভোজন করলে তাদের খাবার পেটে যায় কেনো? কেননা ভোজন তো ব্রাহ্মণদের খাওয়ানোর মাধ্যমে পিতরদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। এ অবস্থায় ব্রাহ্মণদের ক্ষুধিত অবস্থায় রাখা কি উচিত? পিতরদের নাম করে খাদ্য খেলে যদি পিতরদের পেট ভরে যায়, তাহলে ব্রাহ্মণদের পেট ভরল কেমন করে?

যে সব ব্রাহ্মণ মৃতক শ্রাদ্ধে ভোজন করেন, তাঁদের একবার একটু জিজ্ঞাসা করে দেখো তো, যে সমস্ত পিতরদের জন্য তাঁরা ভোজন

পাঠাচ্ছেন, তাঁরা কোথায় আছেন, তাঁদের ঠিকানা জানেন কি? এও জিজ্ঞাসা করো, তাঁরা রোগী হয়ে আছেন, না নীরোগ অবস্থায় ? যদি তিনি রোগী হন, তাহলে তাঁর জন্য হালুয়া, লুচি, পায়েস প্রভৃতির কি প্রয়োজন? গরিষ্ঠ ভোজন করলে তিনি তো আরও রোগী হয়ে পড়বেন। একথা যখন কারো জানা নেই যে, মৃত্যুর পর পিতর আত্মা কোন্ যোনিতে গিয়েছে, আর কোন্ অবস্থাতেই বা তিনি আছেন - সে অবস্থায় ব্রাহ্মণদের পেটে ক্ষীর, লুচি, মণ্ডা-মিঠাই দেবার কোনো মানে হয় কী?

পীড়িত পিতরদের জন্য তিক্ত ঔষধ এবং মুগের ডালের ঝোল দেওয়া প্রয়োজন । গরিষ্ঠ আহার দিলে তিনি যে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন । মৃত্যুর পর পিতর আত্মা কোন যোনিতে গিয়েছে? কোথায় কী অবস্থায় আছে? এ যার জানা নেই সেই ব্রাহ্মণদের পায়েস, লুচি আহার করায় কোন্ যুক্তিতে?

মৃতক শ্রাদ্ধের দিনে যদি কারো পিতর কোন যোনি হতে এসে সূক্ষ্ম শরীরে আহার করার জন্য প্রবেশ করেন, তাহলে যে যোনি হতে পিতর সূক্ষ্ম শরীরে আহার করতে এসেছে সেই শরীরের মৃত্যু হয়ে যাওয়া উচিত। আর একটু বিচার করে দ্যাখো — এক আত্মা, যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে মুক্ত হয়েছে তার আবার সাংসারিক ভোজনের চিন্তা কীসের? মনে কর একটি আত্মা সে তার কর্মানুসারে সিংহ বা নেকড়ে বাঘ হয়েছে, অপর আত্মা মল বা নদীর পোকা হয়েছে, এদের হালুয়া, পুরী দিলে তাদের কোন্ উপকারটা করা হবে বলতো দেখি? প্রত্যেক প্রাণীর আপন

আপন স্বাদিষ্ট ভোজন আছে সকলের পক্ষে তো মানুষের মত ভোজন প্রয়োজন হয় না।

একটু চিন্তে কর যদি কোনো লোক, কারো কাছে চিঠি লিখে ডাকে দেয়, আর সেই চিঠিতে তার কোনো ঠিকানা লেখা না থাকে, তাহলে সে চিঠিটি যাবে কোথায়? এটা কি বুদ্ধিমানের মত কাজ হলো? বিনা ঠিকানার চিঠিটা অভীষ্ট লোকের কাছে পৌঁছাবে? তাহলে ভেবে দ্যাখো, যার কোনো ঠাঁই-ঠিকানা নেই, এমন পিতর আত্মাকে খাওয়াবে বলে তুমি ব্রাহ্মণদের খাইয়ে দিলে বলতো, ভোজ্যগুলি সেই পিতরদের কাছে কেমন করে পৌছাবে? এ তো নির্জলা অন্ধ বিশ্বাস। এক ব্যক্তিকে আহার করালে যদি অপর ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যায়, তাহলে বিদেশ যাত্রী তার সঙ্গে ভোজন নিয়ে যায় কেনো? বিদেশ যাত্রীকে যথা স্থানে যাওয়ার জন্য রওনা করিয়ে দাও। তার বিদেশ থাকা কালে ঘরে ব্রাহ্মণ ডেকে আনো, আর ভর পেট তাঁকে আহার করিয়ে দাও, দেখবে যাত্রীর পেট ভরে গিয়েছে। সে সেখানে হেউ ঢেউ করে ঢেকুর তুলে তৃপ্তি জ্ঞাপন করছে, করবে তো? করবেনা বলছ। সেই কারণেই তো বলছিলাম মৃতক পিতরদের শ্রাদ্ধ করা সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং এ শুধু নিজেকে প্রবঞ্চনা করা মাত্র।

কমলঃ দাদা ! তুমি যুক্তি ও তর্কের দ্বারা একথা প্রমাণ করলে বটে যে, মৃতক পিতরদের শ্রাদ্ধ করা অযৌক্তিক। শুধু তাই নয় একজনকে দেওয়া বস্তু অপর জনে পায় না। কিন্তু আমাকে বলতো, কারো পিতা যদি ঋণ করে মারা যায়, সে ঋণের বোঝা নিজে তো নিয়ে গেল। তারপর তার

ছেলেরা তাদের পিতার মৃত্যুর পর কিছু দিনের মধ্যেই ধনবান হলো। তখন তারা তাদের পিতার ঋণ সব চুকিয়ে দিল এই অবস্থায় মৃতকের আত্মা ঋণরূপ পাপ হতে মুক্ত হবে কিনা? যখন পুত্ররা তাঁর ঋণ শোধ করেই দিল, সে অবস্থায় সে তো আর ঋণী থাকবে না। যদি পুত্রের দ্বারা পিতার আত্মা ঋণরূপ পাপ হতে মুক্ত হতে পারে তাহলে পুত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করলে পিতার ভোজন বিষয়ক তৃপ্তি হবে না কেনো?

বিমলঃ তোমার জানা উচিত যে, পিতার কৃতকর্মের ফল পুত্র এবং পুত্রের কৃতকর্মের ফল পিতা কোনো দিনও ভোগ করে না। মানুষ যা কিছু শুভাশুভ কর্ম করে, তার সংস্কার সূক্ষ্মরূপে শরীরের উপর পড়ে। সেই সঞ্চিতসংস্কার তার সুখ-দুঃখরূপে "ভোগ" গড়ে তোলে। আর সেই ভোগ, তাকে না ভুগিয়ে ছাড়ে না। লৌকিক দৃষ্টিতে পুত্র পিতার ঋণ পরিশোধ করল সত্য কিন্তু ঋণ গ্রহণের যে সংস্কার পিতার আত্মায় রয়ে গেল, সেই সঞ্চিত সংস্কারটাকে পুত্র কেমন করে মেটাবে বলো? এ তো তার অধীনে নেই। যেকোনো মানুষের কৃতকর্মের সংস্কার তার মনে জমা থাকলে, সেই সংস্কারকে মুছে ফেলতে পারে তার কর্ম। তার কর্মসংস্কারকে অপর কেউ কেমন করে মুছে ফেলবে?

দেনা-পাওনা জগতের চিকিৎসা করতে পারে, কিন্তু পিতার সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত জগতের চিকিৎসা সে কেমন করে করবে? যদি স্বীকার করা যায় যে, ঋণ পরিশোধ করায় পিতার আত্মায় যে ঋণের সংস্কার জমে থাকে তা নষ্ট হয়ে যায়, ভাল কথা। আর যদি মনে করা যায় যে,

পিতৃদেব কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ধর্ম পথে চলে ধন উপার্জন করার সংস্কার তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কিন্তু তার পুত্র হাঁদাকান্ত সে এক অপদার্থ। সে তার পিতৃদেবের ধর্মোপার্জিত ধন কিছু মদে, কিছু দুরাচার প্রভৃতিতে উড়িয়ে দিল। এই সব পাপ কর্ম করায় চারদিকে তার নিন্দা ছড়িয়ে পড়ল। এবার বলো, পুত্রের কৃতপাপের ফল পিতার আত্মায় স্পর্শ করবে, কি করবে না? কেননা পুত্র তার পিতৃদেবের ধনে পাপ করেছে। যদি পুত্রের পিতা ঋণ করে, যে ঋণের সংস্কার তিনি আত্মায় নিয়ে মহাপ্রস্থান করেছেন, সে সংস্কার তাঁর আত্মা থেকে ঘুচবে কেমন করে? পিতার ঋণ পুত্র পরিশোধ করে থাকে তার কারণ একদিকে সে দেনাদার, অপরদিকে পাওনাদারও। পুত্র যদি পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়, পিতার দেনা পরিশোধ করবে কে? যে গ্রহণ করবে, সে দেবে, এ তো মনুষ্য সমাজের এক নিয়ম চলে আসছে। কোনো কোনো দেশে আবার এ নিয়মও নেই।

পাশ্চাত্য দেশের কয়েকটি দেশে এ নিয়মও দেখা যায় না। সে দেশে যৌথ পরিবার প্রথা নেই, মাতা-পিতা ততদিন সন্তান প্রতিপালন করে থাকেন, যতদিন না তাঁদের সন্তান স্বাধীনভাবে জীবন নির্বাহ করার যোগ্য হয়। সন্তান যেই যোগ্য হয়েছে, অমনি মাতা-পিতা সন্তানের সঙ্গে আর কোনো প্রকার সম্বন্ধ রাখেন না, সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করেন। সেখানে কেউ কাহারও গ্রহীতাও নয়, আবার কেউ কাহারও অধমর্ণও নয়। যেখানে ঋণ পরিশোধ করার বা না করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, সেখানে প্রত্যেক

ব্যক্তি নিজেই দেনার জন্য নিজেই দায়ী থাকে। তাই, যারা বলে থাকে যে, পিতার আত্মার উপর ঋণের যে পাপ জমে থাকে পুত্র পরিশোধ করে তা ধুয়ে ফেলে, একথা সর্বদা অযৌক্তিক। এই সৃষ্টিতে কে কার ঋণী, এবং কীভাবে কে ঋণী-এর ব্যবস্থা ভগবানই জানেন আর তিনিই একে অপরের ঋণ পরিশোধ করার কর্মানুসারে ব্যবস্থা করে থাকেন। সৃষ্টির বহু কর্ম কাহারও পক্ষে সাধ্য এবং কাহারও পক্ষে সাধন। পরন্তু একথা সত্য যে, একজনের কৃতকর্মের ফল অপরকে ভোগ করতে হয় না।

শ্রাদ্ধের দিনটিকে কোথাও 'কনাগত' বা কর্ণাগর্ত' ও বলা হয়। এ বিষয়ের এক পৌরাণিক গাথা বলি শোনো। সুবর্ণদানকারী কর্ণ তাঁর মৃত্যুর পর স্বর্গে স্বর্ণ লাভ করেছিলেন। তাঁর ক্ষুধার নিবৃত্তি না হওয়ায় তিনি ১৫ দিনের ছুটি নেন, আর মৃত্যুলোকে এসে ব্রাহ্মণদের ভোজন করান, অতঃপর তাঁর পক্ষে স্বর্গে অন্ন গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। কর্ণের পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করার নাম 'কনাগত' বা 'কর্ণাগর্ত' হয়। যদিও এই গাথা সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধে হওয়ায় মিথ্যা কপোলকল্পিত, তবুও এই গাথা হতে আমরা এই সার গ্রহণ করতে পারি যে, নিজের কর্মের ফল নিজেকেই ভোগ করতে হয়। কর্ণকে স্বয়ং স্বর্গ হতে মর্ত্যে ফিরে এসে অন্ন দান দিতে হয়েছিল। তারপর তিনি অন্ন গ্রহণ করতে পেরে ছিলেন। তা না হলে, কর্ণের আত্মীয়-স্বজন তার মৃত্যুর পর মৃত্যুলোকে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে দিলেই তো তিনি স্বর্গেও অন্ন পেতে পারতেন।

কমলঃ আচ্ছা দাদা ! না হয় তাই হলো, মৃতক পিতর না হয় খেতে পেলো না–না পাক। কিন্তু মৃতক পিতরগণের নাম করে খাওয়ালে, তাতে ক্ষতি কী আছে বল? এই অছিলায় কিছু দান পুণ্য হয়ে গেল, এতে মন্দই বা কী? তাঁর স্মৃতিতে কিছু না কিছু পুণ্যও হয়ে গেল।

বিমলঃ ক্ষতির কথা বলছ? শোনো, কী ক্ষতি হয় তাই বলছি।

■ প্রথমতঃ—বৈদিক সনাতন মর্যাদার নাশ হয়। যদি বল কেমন করে? তো শোনো, 'পিতৃ যজ্ঞ' অর্থাৎ পিতরগণের সেবা শুশ্রূষা করা এটা 'নিত্য কর্ম'-র মধ্যে পড়ে। ব্রহ্ম যজ্ঞ, দেব যজ্ঞ, অতিথি যজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, এবং পিতৃ যজ্ঞ—এই পঞ্চ মহাযজ্ঞকে যথাশক্তি নিত্য করা উচিত, বৈদিক শাস্ত্রের এই আদেশ। যদি মৃতক শ্রাদ্ধের ১৫ দিনের তিথি সমূহ স্থির করা হয় এবং তার নাম পিতর পক্ষে রাখা যায় তাহলে নিত্য মর্যাদার খণ্ডন হয়।

মৃতক শ্রাদ্ধ তো বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অনুসারেও হতে পারে না। কেননা, পুত্র যখন ব্রহ্মচর্য আশ্রমে বাস করবে সে সময় পিতা থাকবেন গৃহস্থাশ্রমে। এইভাবে যখন পুত্র গৃহস্থাশ্রমে থাকবে তখন পিতা থাকবেন বানপ্রস্থাশ্রমে তারপর পুত্র যখন বানপ্রস্থাশ্রমে থাকবে তখন পিতা থাকবেন সন্ন্যাস আশ্রমে। আর যখন পিতার মৃত্যুর সময় হবে, তখন পুত্র সন্ন্যাস আশ্রমে থাকবে। এবার একবার চিন্তা করে দ্যাখো, এই অবস্থায় সন্ন্যাসী মৃতক শ্রাদ্ধ করবে কেমন করে? কেননা, সে তো তখন সর্বপ্রকার সকাম ভাবনা

ত্যাগ করেছে তা না হলে, সে কেমন করে সন্ন্যাসী হলো। সন্ন্যাস আশ্রমবাসীর কোনো প্রকার সম্বন্ধ তার পরিবারের কারো সঙ্গে থাকে না। শুধু তাই নয়, সে তখন তো কারো পিতাও নয়, কারো পুত্রও নয়। এই অবস্থায় মৃতক শ্রাদ্ধ হবে কেমন করে শুনি? সন্ন্যাসী, সে পরিব্রাজক। সদুপদেশ দান কালে ভ্রমণরত পরিব্রাজকের কখন কোন তিথিতে এবং কোথায় মৃত্যু ঘটেছে এ সংবাদ তার পুত্র বা পরিবারের অন্যান্য কেউ জানবেই বা কেমন করে? অতএব কোনো প্রকারেই মৃতকের শ্রাদ্ধ শাস্ত্র বিহিত তো নয়ই, যুক্তিসঙ্গতও নয়। বাকী রইল মৃতকের নামে দান পুণ্য করার কথা। পূজনীয় বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞান বৃদ্ধদের স্মৃতিতে অন্নদান, বস্ত্রদান মোটেই মন্দ নয়, অবশ্য যদি পাত্রাপাত্র বিচার করে দান করা যায়। কিন্তু যে কর্ম কোনো অছিলায় করা যায় তার পরিণাম কখনও ভাল হয় না। কেননা অন্তর নির্মল না হওয়ায় দাতার আত্মায় শুভ সংস্কার পড়ে না। যাহা অন্তরে তাই কথায় বা বাণীতে এবং তদনুরূপ যদি কর্ম করা হয় সেটা পুণ্যকর কর্ম। কোনো অছিলায় প্রদত্ত দান নয় এবং তা পুণ্যকরও নয়।

যদি আপন পিতৃ পুরুষদের পুণ্য স্মৃতিতে খাওয়ান-পরান বা দান করা আবশ্যকই হয় তাহলে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের ১৫ দিন স্থিরীকৃত তিথিতেই অন্ন-বস্ত্র দান করতে হবে কী কারণে? অন্ন-বস্ত্রহীন অসহায় অন্ধখঞ্জ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের হোক না সে অন্য দেশের বা সমাজের,– দান দিতে ক্ষতি কী? পিতর ব্যক্তিদের স্মৃতিতে দান করলে পিতরদের

প্রকৃত স্মৃতি রক্ষা হয় সেই দিন, যেদিন তাদের স্মরণীয় দিবস—যথা শ্রীরামনবমী, কৃষ্ণজন্মাষ্টমী। শ্রীরাম ও কৃষ্ণের জন্ম দিন প্রতিপালিত হয় যেদিন তাঁদের জন্ম হয়েছিল। ঠিক তেমনি পিতরগণের স্মৃতি সেই দিন প্রতিপালনীয় যে দিন তাঁরা মহাপ্রস্থান করেছিলেন। তাহলে স্বীকার করব যে, হ্যাঁ 'তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে।' অন্যথা মৃতের শ্রাদ্ধ ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয়।

কমলঃ দাদা! এ বিষয়ে তুমি যথার্থই বিচার বিবেচনা করেছ। এবার আর একটা জিজ্ঞাস্য। হবন-যজ্ঞ করে লাভ কী? মানুষ ঘি এবং হবন সামগ্রী আগুনে কেনো জ্বালিয়ে নষ্ট করে?

বিমলঃ এর উত্তর আগামীকাল দেব কেমন?

হবন যজ্ঞ এবং যজ্ঞোপবীত

(অষ্টম দিন)

বিমলঃ তোমার কালকের প্রশ্ন ছিল- হবন-যজ্ঞ করে লাভ কী?

যজ্ঞ করার লাভ অনেক। ঘি, হবন সামগ্রী ব্যর্থ জ্বালানো হয় না। যজ্ঞে ঘি এবং সামগ্রী যা জ্বালানো হয় সেই হুত ঘি এবং হবন সামগ্রী বায়ুমণ্ডলকে বিশুদ্ধ করে, বায়ু শুদ্ধ হলে রোগের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

কমলঃ যজ্ঞ করলে বায়ু কেমন করে শুদ্ধ হয়?

বিমলঃ হবন সামগ্রীতে চার প্রকার পদার্থ মেশানো থাকে (১) রোগনাশক পদার্থ, (২) সুগন্ধিত পদার্থ, (৩) মধুর পদার্থ এবং (৪) পুষ্টিকর পদার্থ। এই সমস্ত পদার্থযোগে যজ্ঞ করলে বায়ুমণ্ডলে স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর যে সমস্ত জীবাণু আছে সেগুলি মরে যায়। এরই নাম বায়ুশুদ্ধিকরণ। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিণাম শুদ্ধ বর্ষা ও বর্ষণের সম্ভাবনা। এই যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা অন্ন এবং ঔষধি সমূহ গুণকারী হয়, এক কথায় যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা প্রাণীমাত্রের কল্যাণ হয়।

কমলঃ আমার মনে হয় মানুষ যদি রোগনাশক এবং পুষ্টিকর পদার্থ ভোজন করে, তাহলে অধিক লাভদায়ক হতে পারে। মিছামিছি ঐ সমস্ত

পুষ্টিকর এবং মূল্যবান পাদার্থ জ্বালিয়ে নষ্ট করাই তো হয়। তাছাড়া যজ্ঞ করলে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই বা থাকে কেমন করে?

বিমলঃ আমার বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে, পুষ্টিকর এবং রোগনাশক খাদ্য পদার্থ খাওয়া উচিত নয়। পুষ্টিকর এবং রোগ-নাশক খাদ্য পদার্থ খাবে বৈকি ! ঐ সমস্ত পদার্থ দ্বারা যথাশক্তি যজ্ঞও করা উচিত। পুষ্টিকর এবং রোগ-নাশক খাদ্য পদার্থ সেবন করে শরীরকে যেমন পুষ্ট রাখা প্রয়োজন, তেমনি ঐ সমস্ত পদার্থ দ্বারা হবন করে বায়ুকে বিশুদ্ধ রাখাও প্রয়োজন। যদি কোন ব্যক্তি বায়ুকে শুদ্ধ না করে অশুদ্ধ করে, তাকে শুদ্ধও তো করতে হবে। শুদ্ধ করাটা কার ধর্ম?

দ্যাখো, দেহ হতে যা কিছু নির্গত হয় সেগুলি যে মলময় তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। চোখের পিঁচুটি সে এক প্রকার মল, কান দিয়ে যা বেরিয়ে আসে, সেও মল। মুখের থুতু এবং নাকের শ্লেষ্মা এবং ঘাম সেও মল। মলমূত্র সেও মল। এইভাবে দেহ হতে যে বায়ু বেরিয়ে আসে তাও দুর্গন্ধময়। মানুষ বাইরে থেকে অন্ন, জল, বায়ু, মেওয়া ফল প্রভৃতি যা কিছু খায় তা সবই পবিত্র। কিন্তু খাদ্য দ্রব্যগুলি পেটের ভিতরে যখন যায় সেখান থেকে সেগুলি আর একরূপে বাইরে এসে জল, বায়ুকে দূষিত ও দুর্গন্ধময় করে। আর একথা সকলের জানা আছে যে বায়ুই প্রাণীর জীবন। অন্ন-জল ছাড়া প্রাণী দু-চারদিন অথবা কখনও এর চেয়ে অধিক দিন বেঁচে থাকতে পরে না। কিন্তু বায়ু ছাড়া প্রাণী একঘন্টাও বেঁচে থাকতে

পারে না। যখন বায়ুই প্রাণীর জীবনাধার, সেই অবস্থায় সেই বায়ুকে শুদ্ধ পবিত্র রাখার প্রয়োজন কী নেই?

জল-বায়ু দূষিত হলে নানা প্রকার রোগ ছড়িয়ে পড়ে, প্লেগ ও কলেরা প্রভৃতি রোগের আক্রমণও হয় কেবল জল বায়ুর দোষে। রোগীর দেহের জীবাণু এবং ইঁদুরের পেটের জীবাণু তো বায়ুর মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং ভয়ঙ্কর রোগ সৃষ্টি করে। সে কারণে বায়ুকে বিশুদ্ধ রাখতে হলে, যজ্ঞ বা হবনের চেয়ে উৎকৃষ্ট অন্য কোনো উপায় থাকতে পারে না।

তুমি যে বলছ—"পুষ্টিকর পদার্থ সমূহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে কেনো নষ্ট করা হয়?" বাস্তবিক পক্ষে এ সব অবুঝের কথা, জগতে কোনো পদার্থেরই বিনাশ হয় না। কেবল তাদের রূপের পরিবর্তন হয় মাত্র। দ্যাখো, জল যখন আগুনের তাপে শুকিয়ে যায় তখন অবুঝ মনে করে জল জ্বলে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ জানে যে, জল আগুনের তাপে বাষ্প রূপে আকাশের বায়ুতে মিশে গেল,—নষ্ট হলো না।

তেমনি, যজ্ঞের সামগ্রী জ্বলে পুড়ে নষ্ট হয় না। সেই হুত সামগ্রী সূক্ষ্মরূপে বায়ুকে শোধন করে তথা বায়ুতে মিশ্রিত হয়ে বাষ্পকে শুদ্ধ জমাট বাঁধানোর জন্য ঘি "সাজার" কাজ করে। শত শত মন দুধের দই জমাতে হলে যেমন একটুখানি "সাজা" দিলেই দই জমে, তেমনি পরমাণু কৃত ঘি মেঘপুঞ্জ হয়ে বর্ষার কারণ হয়ে দেখা দেয়। যদি মানুষ বিধি ও নিয়মানুসারে যজ্ঞ করে, তাহলে যথা সময় বর্ষণ হতে বাধ্য। প্রাচীনকালে

বিধি-বিধান অনুসারে যজ্ঞ হতো তাই যথা সময় প্রচুর বর্ষণও হতো। তাই দেখা গেছে, সেকালে অকাল পড়ত না, আর আজ-কালকার মতো নানা রোগের বিস্তারও ছিল না।

কমলঃ তবে কি বাড়ীতে সুগন্ধিত ও রোগনাশক পদার্থ রাখা উচিত নয়? ওসব দিয়ে কি জলবায়ু বিশুদ্ধ হয় না? আর ঘি জ্বালালেই বুঝি জলবায়ু শুদ্ধ হয়ে যায়? ঐ সব পদার্থ জ্বালানোর বৈশিষ্ট্যই বা কী শুনি?

বিমলঃ শোন, বাড়ীতে রোগ নাশক পদার্থসমূহ রাখা যেমন প্রয়োজন, তেমনি ঐ সমস্ত পদার্থসমূহ দ্বারা যজ্ঞ করাও প্রয়োজন। যজ্ঞ করলে হুত পদার্থসমূহের শক্তি কোটি কোটি গুণ বৃদ্ধি পায়। এর প্রমাণ চাও? শোনো— একজন লোক এক সঙ্গে চারটে লঙ্কা খেতে পারে, তার জ্বালা অনায়াসে হু হা করে বা না করে সহ্য করে নেয়। কিন্তু যদি সেই মানুষটি লঙ্কার সামান্য টুকরো আগুনে ফেলে দেয়, দেখবে তার সেই তীব্রজ্বালা সে সহ্য করতে পারবে না। তখন তার হাঁচতে হাঁচতে আর কাশতে-কাশতে নাড়ি ছেঁড়ার জোগাড় হবে। শুধু তাই নয়, পাড়া প্রতিবেশী যারা সেই লঙ্কা পোড়ার গন্ধ পাবে তাদেরও সেই অবস্থা হবে,—নাড়ী ছেঁড়ার জোগাড়। লঙ্কা পোড়ার তীব্র ঝাঁঝ অসহ্য হয়ে যাবে যাদের নাকে লঙ্কা পোড়ার তীব্র ঝাঝ যাবে, তারা অলক্ষ্যে যে কত বিরক্তিকর কথাই না বলবে, তা অনুমান করাই যায় না। কোনো বুদ্ধিহীন লঙ্কা জ্বালিয়েছে একথা অনেকেই বলবে, তাতে আর সন্দেহ কোথায়? কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি গাওয়া ঘি জ্বালায়, আর তার সঙ্গে থাকে সুগন্ধি এবং মিষ্টি পদার্থ

মিশ্রিত হবন সামগ্রী, তাহলে লোকে বলবে,— "নিশ্চয়ই আশে পাশে কেউ যজ্ঞ করছে, তাই তো এতো সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে।" এবার তুমি নিশ্চয় বুঝবে যে অগ্নি যে পদার্থকে জ্বালায়, সেই জ্বালিত পদার্থের পরমাণুর শক্তি বহু পরিমাণ বৃদ্ধি পায় । যজ্ঞ অপেক্ষা উপকারী কর্ম দ্বিতীয় আর একটিও নেই। যজ্ঞকে গুপ্ত দান বলে জানবে। যজ্ঞ দ্বারা শুধু আপন ঘরের বায়ুই শুদ্ধ হয় না, পরের ঘরের বায়ুও শুদ্ধ হয়। শুধু-শুধু কেউ অপরের দান গ্রহণ নাও করতে পারে, কিন্তু যজ্ঞ কর্মদ্বারা ইচ্ছায় হোক্ বা অনিচ্ছায়, তাকে অপরের দান গ্রহণ করতেই হয় । কেননা যজ্ঞসামগ্রী অগ্নির মুখে পড়ে সূক্ষ্ম রূপ নেয়, সেই সূক্ষ্ম যজ্ঞীয় পরমাণু বায়ু সহযোগে ঘরে ঘরে প্রবেশ করে এবং রোগের জীবাণুকে বিনষ্ট করে।

কমলঃ জগতের দুর্গন্ধ এবং রোগের জীবাণু সমূহকে সূর্য তার কিরণ দিয়েই ধ্বংস করে থাকে। এ অবস্থায় যজ্ঞ করা ছাড়াই অনায়াসে যদি তা হয়, তাহলে সেই কাজের পিছনে এত মাথা ঘামবার কোনো প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না? সে কাজ ব্যর্থ ছাড়া আর কী হতে পারে?

বিমলঃ ভাল কথা । আচ্ছা বলতো, সূর্য-চন্দ্রোদয়ের মূলে মানুষ নেই, অথচ তারা উদয় হচ্ছে, তারা আলো দিচ্ছে। এ অবস্থায় মানুষ আলো পাওয়ার আশায় বিজলী বাতি, গ্যাস, লণ্ঠন ও প্রদীপের সাহায্য নেয় কেনো? এই বিশাল সৃষ্টিতে ফল, বনস্পতি, মেওয়া তো সদাসর্বদা উৎপন্ন হচ্ছে, তবে আবার মানুষ বৃথা চাষ আবাদ করে কেনো? তরি-তরকারী

শাক-সব্জীর চাষ করে কেনো? দেহের মধ্যে রোগ দূর করার স্বাভাবিক শক্তি ভগবান সকলকে দিয়েছেন। হৃদয় নিরন্তর দূষিত রক্তকে শোধন করছে, উদরের অস্ত্রসমূহ সদাসর্বদা ভুক্ত অন্ন-জলকে বিভাজন করে দেহের বিভিন্ন অংশে পাঠিয়ে দিচ্ছে, আর ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে উত্তম খাদ্যপ্রাণ জুগিয়ে চলেছে আর দূষিত অংশটিকে বাইরে ফেলে দিচ্ছে।

রোগ দূর করার সমুচিত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, আবার কেনো মানুষ রোগ দূর করার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করে? আর কেনোই বা পানাহার বিষয়ে সংযমী হয়ে থাকার চেষ্টা করে? দেখতে গেলে, সৃষ্টির এই নিয়মই তো মানুষকে আপন অনুকূলে চলার প্রেরণা দিয়ে আসছে, কী জন্যে? মানুষের কল্যাণের জন্যে। সৃষ্টির নিয়ম আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, সূর্য যেমন স্বীয় কিরণ দ্বারা দূষিত পদার্থসমূহকে দূরে সরিয়ে দেয় ঠিক তেমনি তুমিও দূষিত পদার্থ দূর করো। সূর্য যেমন জগতের বায়ু শুদ্ধ করে, তুমিও তেমনি বায়ুকে শুদ্ধ করো। যজ্ঞরূপ পরোপকার সাধনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যজ্ঞ।

কমলঃ আচ্ছা, তাই না হয় হলো। বলতো, যজ্ঞের সময় মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় কেনো?

বিমলঃ ■ প্রথমতঃ—মন্ত্র সমূহে যজ্ঞের উপকারিতা বর্ণনা করা হয়, এবং সেই সঙ্গে উপকারিতার কথাও শোনান হয়।

■ দ্বিতীয়তঃ মন্ত্র পাঠ করলে মন্ত্র কণ্ঠস্থ থাকে, বেদ রক্ষা হয়।

■ তৃতীয়তঃ —যে বিষয়ে বার বার বলা হয়, তার প্রতি শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি পায়। শ্রদ্ধা জাগ্রত হলে কর্মে প্রবৃত্তি জন্মে। কর্মে প্রবৃত্তি জন্মালে, আত্মায় কর্মকাণ্ডের প্রতি উত্তম সংস্কার জন্মায় আত্মায় কর্মকাণ্ডের সংস্কার জন্মালে মানুষ তার জীবনের লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছায়।

কমলঃ আচ্ছা দাদা, এ প্রসঙ্গ তো শেষ হলো। এবার বলো দেখি, যজ্ঞোপবীত ধারণ করলে কী মনে হয়? মানুষ তিন গাছা সূতো গলায় জড়িয়ে রাখে কেনো? কেউবা ছয় গাছাও জড়ায়, এর রহস্য কী তাতো বুঝলাম না। এর রহস্য সম্বন্ধে একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলো না।

বিমলঃ যজ্ঞোপবীতকে 'প্রতিজ্ঞা সূত্র' বা 'ব্রত সূত্র'ও বলা হয়। যজ্ঞসূত্র ধারণের সঙ্গে মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য পালন করার ব্রত জড়িত। বাস্তবিক পক্ষে যজ্ঞোপবীতের তিনটি সূত্র 'ব্রহ্ম গ্রন্থি' দ্বারা বাঁধা। এই সূত্রত্রয় কর্তব্যপরায়ণ মানুষকে তিনটি ঋণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই ঋণত্রয়ের একটি 'দেব-ঋণ', দ্বিতীয়টি 'পিতৃ-ঋণ' আর তৃতীয়টি 'ঋষি-ঋণ'। দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ এবং ঋষি-ঋণ হতে সকলকে ঋণমুক্ত হতে হয়।

ভগবানের দেওয়া আলো, বাতাসকে হবন-যজ্ঞ দ্বারা শুদ্ধ রাখার কর্মকে বলে 'দেব যজ্ঞ'। যে ব্যক্তি যথাবিধি শ্রদ্ধা সহকারে হবন না করে, সে দেব ঋণের দায়ে ঋণী হয়। তাই তাকে হবন করে দেব-ঋণ পরিশোধ

করতে হয়। কেননা, আমরা বরুণদেব অর্থাৎ জল, মেঘ, পবনদেব অর্থাৎ বায়ু এবং অগ্নিদেব এদের সকলের কাছে বিবিধ প্রকার উপকার পেয়ে থাকি। তাই আমরা ঐ সব দেবতাদের কাছে ঋণী। যে ব্যক্তি উপকারীর উপকার তো স্বীকার করেই না, অধিকন্তু তাদের নানাভাবে অশুদ্ধ করে বেড়ায় এবং বিশুদ্ধতা সম্পাদন করে না সে কৃতঘ্ন তো বটেই, অশুদ্ধ করার দোষেও দুষ্ট। এদের পবিত্রতা সম্পাদন হয় ঘৃত মিশ্রিত হবন-সামগ্রী ও মধুর পদার্থ, মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা অগ্নির মুখে আহুতি প্রদান করে।

তুমি জানো যে, কৃতঘ্ন মানুষকে সংসারে কেউ বিশ্বাস করে না। সার কথা, যজ্ঞোপবীত বা যজ্ঞসূত্রের এক গাছা সূত্র হবন-যজ্ঞ দ্বারা 'দেব-ঋণ' পরিশোধ করার ব্রত স্মরণ করিয়ে দেয়। যজ্ঞসূত্রের দ্বিতীয় গাছাটি 'পিতৃ-ঋণ' অর্থাৎ মাতা-পিতার সেবা করার ব্রত স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ যে গুরু বা 'আচার্য' বিদ্যাধ্যয়ন এবং শিক্ষাদীক্ষা তথা সৎ উপদেশ দান করে সত্য পথ দেখিয়েছেন। তাঁদের সদা সেবা করা উচিত। তাছাড়া ঐ ত্রিসূত্র যজ্ঞোপবীত আরও বহু শুভ কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যথা জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনা। এই তিনটি ঈশ্বর লাভের সাধন। মানুষ যজ্ঞোপবীত ধারণ করে সংস্কার গ্রহণ করে, জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর লাভ করবে বলে। সে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা অতিক্রম করে 'তুরীয়' অবস্থায় প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবে। সে প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক গুণের স্বরূপ জেনে জীবনের লক্ষ্য পরমেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত

হবে। সে ছোট, বড় এবং তার সমান যারা, তাদের সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার করবে। অর্থাৎ যারা তার বড়, তাদের সমাদর, যারা তার সমান তাদের সঙ্গে প্রেম ভালবাসা এবং যারা তার কনিষ্ঠ, তাদের প্রতি প্রীতি, দয়া দেখাবে। এরূপ বহু মহত্বপূর্ণ কথার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আদর্শ যজ্ঞোপবীত আমাদের সামনে তুলে ধরে।

কমলঃ তোমার কথায় বেশ বুঝলাম, তুমি যজ্ঞোপবীতের তিনটে সূত্র স্বীকার কর। আমি তোমাকে শত শত যজ্ঞোপবীতধারী দেখাতে পারি যারা ছয় সূত্র যুক্ত যজ্ঞোপবীত ধারণ করে থাকে। আর এক কথা, তুমি যতগুলি প্রতিজ্ঞার কথা শোনালে সেগুলো তো এমনিই মনে রাখা যায়। গলায় সূতো জড়িয়ে মানুষকে বন্ধনে বেঁধে রাখার কী কোন মানে হয়?

বিমলঃ হ্যাঁ, একথা আমি স্বীকার করি যে, তুমি অনেক লোককে ছয়সূত্র যুক্ত যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে অবশ্যই দেখে থাকবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যজ্ঞোপবীতের সূত্র তিন গাছা। প্রাচীনকালে নারীও যজ্ঞোপবীত ধারণ করেছে এবং বেদাদি সৎশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছে। কিন্তু কালের গতিকে স্বার্থান্বেষী পুরুষ হিন্দু সমাজে নারীর যজ্ঞোপবীত ধারণের এবং বেদ অধ্যয়নের অধিকার হরণ করে তাদের বেদ এবং উপবীতহীন করে ছেড়েছে। তারা স্ত্রীর গলার উপবীত নিয়ে নিজের গলায় ঝুলিয়ে রাখা আরম্ভ করেছে। তারপর এলেন মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী। তাঁরই কৃপায় নারী আবার তাঁদের যজ্ঞোপবীত ধারণের এবং বেদপাঠের অধিকার ফিরে পেলো। পরিণাম স্বরূপ লক্ষলক্ষ আর্য ভাই-বোন 'ত্রিসূত্র' ধারণ

করেছে এবং করছে কোনো আর্যপুরুষ ছয় সূত্রের যজ্ঞোপবীত ধারণ করে না।

হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, যারা নারী জাতির উন্নতি এবং শিক্ষার বিরোধী তারাই কেবল ছয় সূত্রের যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। বাকী রইল "যতগুলি প্রতিজ্ঞার কথা বলা হয়েছে সেগুলি তো এমনি মনে রাখা যায় মিছিমিছি গলায় কয়েক গাছা সূতো জড়ানোর প্রয়োজন কী?" দ্যাখো ভাইটি ! তোমার কথা হলো প্রহরীকে তার কর্তব্য বিষয়ক সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হোক্, কিন্তু তাকে যেন তার পোষাক ও পাগড়ীঃ—যাকে, বলে চাপরাস তা না দিলেই চলবে। পোষাক ও চাপরাশের বন্ধনে রাজ্য প্রহরীকে বেঁধে লাভ কী? ভাল কথা। আমি জিজ্ঞাসা করি, রাজ্য প্রহরী যদি তার পোষাক ও চাপরাশ না পরে, তাহলে—নাগরিক ও রাজ্য প্রহরী এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রইল কোথায়?

আর এক কথা, কেমন করে জানা যাবে যে, এ একজন রাজ্য-প্রহরী? নাগরিক জনসাধারণ তার প্রতিপত্তিকে মানবেই বা কেমন করে? এই আলোচনায় জানা গেল যে, রাজ্য প্রহরী যেমন তার কর্তব্যের কথা স্মরণ রাখবে, তেমনি তাকে রাজ্য প্রহরীর পোষাক এবং চাপরাসও ধারণ করতে হবে—এ দুটোই পরম আবশ্যক। এই উদাহরণ যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। দ্বিজের কর্তব্য বিষয়ক প্রতিজ্ঞা সমূহ স্মরণ রাখার যেমন প্রয়োজন আছে, তদ্রূপ দ্বিজত্বের চিহ্নস্বরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করার প্রয়োজনও আছে।

কমলঃ ও তাই বুঝি ! আচ্ছা, লোক কানে যজ্ঞোপবীতটাকে জড়িয়ে রাখে কেনো?

বিমলঃ মলমূত্র ত্যাগকালে কানে জড়িয়ে রাখা হয়।

কমলঃ তা' কেনো? কানে জড়িয়ে না রাখলে কী হয় ?

বিমলঃ এতে একটা লাভ আছে। যত সময় উপবীত কানে জড়ান থাকে তত সময় এ কথা মনে থাকে, তাকে মুখ হাত ধুয়ে শুদ্ধ হতে হবে। মুখ হাত ধুয়ে শুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কান থেকে যজ্ঞাপবীতকে নামিয়ে রাখা হয়। এদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে যজ্ঞোপবীত যে পরম পবিত্র, সেটা যে পবিত্র করে রাখতে হবে, একথা মনে রাখবার এরূপ ক্রিয়াও একটা সাধন।

কমলঃ কানে যজ্ঞোপবীত জড়িয়ে রাখা কী একান্ত প্রয়োজন?

বিমলঃ একান্ত প্রয়োজন নয়, কিন্তু যদি কানে তুলে রাখা যায় তাতে ক্ষতিটাই বা কী শুনি? পবিত্রতার ভাবনা দৃঢ় থাকে সে কথা আমি তোমাকে আগেই বলেছি। হ্যাঁ, আর এক কথা। যজ্ঞোপবীত যদি খুবই নিচে নেমে আসে, তাহলে মলমূত্রের ছিটে-ফোঁটায় উপবীত অপবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা অধিক থাকে। এই অবস্থায় যদি কানে যজ্ঞোপবীত তুলে রাখা যায় তাহলে তাতে অপবিত্রতার ছোঁওয়া লাগে না তাই কানে তুলে রাখা প্রয়োজন।

কমলঃ আর্যরা মাথায় শিখা ধারণ করে কেনো? সন্ধ্যাবন্দনার প্রাক্কালে তাতে গাঁঠই বা বাঁধে কেনো?

বিমলঃ 'শিখা' শব্দ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানুষের সর্বোচ্চ শিখর দেশ মস্তকের উপরিভাগ যেখানে শিখা ধারণ করা হয় । মস্তকের উপরিভাগে অর্থাৎ শিখর দেশে যেখানে কেশগুচ্ছ ধারণ করা হয় তাকে 'ব্রহ্ম রন্ধ্র' বলে। যৌগিক পরিভাষায় একে বলে 'সত্যম্' । এই জন্যই সন্ধ্যা করার সময় বলা হয় "সত্যং পুনাতু পুনঃ শিরসি" । সন্ধ্যা করার প্রাক্ ভাগে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করে সর্বপ্রথম শিখা বন্ধন করতে হয় । এর উদ্দেশ্য,—উপাসক তার আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যেন গ্রন্থি দ্বারা যুক্ত করছে । যেমন নাকি, বিবাহ মণ্ডপে কন্যা পতিকে বরণ করার শেষ চিহ্নস্বরূপ তার প্রতিজ্ঞার অন্তিম পূর্ণতাকে কার্যান্বিত করার জন্য বরের উত্তরীয়ের এক খুঁট, কন্যা নিজের কাপড়ের আঁচলের সঙ্গে বেঁধে রাখে । এই 'গাঁঠ-ছড়া বাঁধা' বিবাহের অন্তিম বন্ধন । বাস্তবিক পক্ষে শিখা ধর্মের একটা চিহ্ন মাত্র, এছাড়া আর কিছুই নয় ।

কমলঃ দাদা ! আমাকে শিখা ধারণের উপযোগিতা সম্বন্ধে একটু বলো। আর্যরা মস্তকে কেনো শিখা রাখে, আর অন্যান্য সকলে কেনো রাখে না।

বিমলঃ আমি একথাও প্রথমে বলেছি যে, শিখা আর্যদের ধার্মিক চিহ্ন । শিখা অর্থাৎ শিখর,—উচ্চ বৈদিক ধর্ম ঈশ্বরীয় হওয়ার শিখর স্থানীয় ধর্ম। এইজন্যই শিখাকে ধার্মিক চিহ্ন রূপে রাখা হয়েছে । বেদ যাদের ধর্ম নয়,

তারা শিখা রাখবে কেনো? শিখর স্থানীয় ধর্মের অনুরাগী যারা তারাই শিখার চিহ্ন ধারণ করে থাকে।

কমলঃ আচ্ছা দাদা ! এবার যাই,— কেমন? আগামী কাল এক অতি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

বিমলঃ ভাল কথা, তাই হোক।

বর্ণব্যবস্থা জন্ম অনুসারে–না, কর্মানুসারে

(নবম দিন)

কমলঃ দাদা ! আজ তোমাকে বলতে হবে সমাজে যে এত জাতি আছে, তা' জন্মানুসারে, না কর্মানুসারে?

বিমলঃ জাতি জন্মানুসারেই হয়, কর্মানুসারে হয় না।

কমলঃ একদিন তুমি আমায় বলেছিলে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এসব জাতি কর্মানুসারেই হয়ে থাকে, আর আজ বলছ, জাতি জন্মানুসারে হয়, কর্মানুসারে হয় না।

বিমলঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তো কর্মানুসারেই হয়, কিন্তু জাতি,—জন্ম অনুসারেই হয়ে থাকে।

কমলঃ এর মানে কী হলো? তাহলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এরা জাতি নয়?

বিমলঃ না, এরা বর্ণ। জন্মকাল হতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত যা স্থির থাকে তাকে 'জাতি' বলে। জাতির কোনো পরিবর্তন হয় না, যথা মনুষ্য জাতি, পশু জাতি। মানুষ, পশু হতে পারে না, আর পশু? সে মানুষ হতে পারে না। যার যা জাতি সে সেই জাতিতে থাকবে।

কমলঃ তাহলে কি বর্ণের পরিবর্তন হয়?

বিমলঃ বর্ণের কেনো পরিবর্তন হবে? বর্ণ শব্দের অর্থ হলো—স্বীকৃত,—যা স্বীকার করা হয়েছে। "বর্ণ স্বীকারঃ" বর্ণ যখন গুণ কর্মানুসারে স্বীকৃত, সে কারণে যার যেমন গুণ কর্ম হবে, সে সেই বর্ণের হবে।

কমলঃ তাহলে কি তুমি বলতে চাও যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি 'বর্ণ' ঈশ্বর কৃত নয়?

বিমলঃ ঈশ্বর জাতি সৃষ্টি করেছেন তবে একথা সত্য যে, ভগবান মানব সমাজকে গুণ-কর্মানুসারে বর্ণে বিভাগ করার উপদেশ বেদজ্ঞান দানের মধ্য দিয়ে দিয়েছেন।

কমলঃ কোন্ কোন্ গুণ ও কর্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি বর্ণ হয়ে থাকে?

বিমলঃ বেদ, শরীরের দৃষ্টান্ত দিয়ে উপদেশ দিয়েছেন—

"ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।

ঊরূ তদস্য য়দ্বৈশ্যঃ পদভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।। "

যজুঃ ৩১/১১ ।।

অর্থাৎ,সমাজরূপী দেহের মুখ 'ব্রাহ্মণ' স্বরূপ, বাহু 'ক্ষত্রিয়', উদর 'বৈশ্য' এবং পা'শূদ্র' তুল্য। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, শরীরের অঙ্গ মধ্যে 'মুখ' — জ্ঞান প্রধান অঙ্গ, কেননা—মুখে কান, নাক, চোখ,

জিভ প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় বিদ্যমান আর এক কথা, শীত ও বর্ষা ঋতুতে সমস্ত শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়, কিন্তু মুখ সকল সময় অনাবৃত থাকে। মুখ শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা আদি সকল ঋতুতেই নিজেকে অনাবৃত রাখে, এবং শীত, গ্রীষ্ম সহ্য করে। শুধু তাই নয়, মুখ যা কিছু গ্রহণ করে সে কোনো কালেও নিজের কাছে সঞ্চয় করে রাখে না। বরং সে অন্যকে দান করে দেয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যার কাছে জ্ঞান, তপস্যা ও ত্যাগ আছে—সেই 'ব্রাহ্মণ'।

বাহুকে ক্ষত্রিয় সংজ্ঞা দেওয়ার অর্থ এই যে, বাহু অর্থাৎ হাত 'বল' প্রধান, শরীরে যখনই কোনো আক্রমণ হয়, তখনই প্রথমে হাত আত্রান্ত স্থানকে রক্ষার্থে উপস্থিত হয়। অতএব যে ন্যায়ানুসারে স্বীয় বল বা পরাক্রম দ্বারা প্রজার রক্ষা করে সেই 'ক্ষত্রিয়'।

পেটকে বলা হয়েছে 'বৈশ্য'। কেননা— পেট সমস্ত ভোজ্য নিজের মধ্যে সঞ্চয় করে। তারপর তাকে যথাযথভাবে পরিপাক করে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রয়োজনানুসারে সব ভাগ করে দেয়। অতএব যে ধন সঞ্চয় করে মানব সমাজে যথোচিতভাবে সঞ্চিত ধনকে বিতরণ করে থাকে, সেই 'বৈশ্য' পদ বাচ্য।

পা কে 'শূদ্র' নামে অভিহিত করা হয়েছে কেননা, প্রথমতঃ—পা সমস্ত শরীরের বোঝা নিয়ে বেড়ায়। দ্বিতীয়তঃ— পরিশ্রম করে, মাথা পেট, হাত প্রভৃতি অঙ্গ যেখানে তারা যেতে চায় সেখানে তাদের পৌঁছে দেয়। শূদ্রের কাছে না আছে 'জ্ঞান' আর না আছে 'ধন' যে, তা দিয়ে সে কাজ

করবে। তার কাছে পরিশ্রম করার শক্তি আছে মাত্র। মোট কথা, যে সেবক সে 'শূদ্র'। ব্রাহ্মণ জ্ঞান দ্বারা, ক্ষত্রিয় বল দ্বারা, বৈশ্য ধন দ্বারা, আর শূদ্র পরিশ্রম দ্বারা মানব সমাজের সেবা করে, এইখানেই বর্ণের মহত্ত্ব।

কমলঃ জ্ঞান, বল, ধন ও পরিশ্রম এ সমস্ত তো প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অল্প-বিস্তর পাওয়াই যায় সে দিক দিয়ে দেখলে তো প্রত্যেক মানুষই চার বর্ণের অন্তর্গত। এই অবস্থায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি এরা পৃথক পৃথক কীভাবে হতে পারে?

বিমলঃ এ কথা সত্য যে, মানুষের মধ্যে চতুর্বর্ণের যোগ্যতা আছে, কিন্তু যে ব্যক্তির মধ্যে যে গুণের প্রাধান্য দেখা যায়, তারই ভিত্তিতে বর্ণকে স্বীকার করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কোনো না কোনো একটা প্রধান গুণ অবশ্যই থাকে। কেহ ধনবান, আবার কেহ গুণবান, কেহ বলবান, আবার কেহ সেবাপরায়ণ সেবক। তারই ভিত্তিতে বর্ণকে স্বীকার করা হয়। বেদ বীজাকারে বর্ণের এক আলংকারিক রূপদান করেছে মাত্র। বুদ্ধিমান সেই অলংকারের রহস্যোদ্ঘাটন করবে।

কমলঃ একটু পরিষ্কার করে, বুঝিয়ে বল না দাদা! কী কী কাজ করলে মানুষ সেই বর্ণ মধ্যে পরিগণিত হয়।

বিমলঃ যার মধ্যে শম, দম, তপ, পবিত্রতা, শান্তি, কোমলতা, জ্ঞান বিজ্ঞান এবং আস্তিক্য পাওয়া যাবে সে ব্যক্তি 'ব্রাহ্মণ'।

যার মধ্যে বীরত্ব, তেজস্বিয়তা, ধীরতা, দক্ষতা, যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করা, তথা দানশীলতা এবং ন্যায়কারিতা, ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতার ভাব পাওয়া যাবে সে ব্যক্তি 'ক্ষত্রিয়'।

যার মধ্যে কৃষি, গোরক্ষা, দান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে নিপুণতা পাওয়া যাবে সে 'বৈশ্য'।

আর যে নিজ শরীর দ্বারা সেবায় পটু,—সে ব্যক্তি'শূদ্র'।

কমলঃ আচ্ছা, এদের যদি জন্মগতভাবে স্বীকার করা যায় তাতে আপত্তি কী থাকতে পারে? কোটি কোটি মানুষ বর্ণ স্বীকার করে কি?

বিমলঃ যারা জন্মগতভাবে বর্ণ স্বীকার করে না তাদের মতেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণকে 'দ্বিজ' বলা হয় শূদ্রকে প্রথমজ স্বীকার করা হয়ে থাকে। 'দ্বিজ' শব্দের অর্থ—যার দু'বার জন্ম হয়।

"দ্বাভ্যাং জায়তে ইতি দ্বিজঃ"। জগতে যাদের দুবার জন্ম হয়েছে তারাই 'দ্বিজ' পদ-বাচ্য। যথা—দাঁত, পাখী। দাঁতকে দ্বিজ বলা হয় যেহেতু এদের দুবার জন্ম হয়। ছোট ছেলের দুধে দাঁত ভেঙে যায়। দ্বিতীয় বার আবার দাঁত জন্মায়। পাখী 'দ্বিজ', কেননা তাদের দুবার জন্ম হয়। প্রথম ডিমের মধ্যে জন্ম হয়, তারপর ডিম ভেঙে দ্বিতীয় বার জন্ম হয়। এবার একটু বিচার-বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন, পাখীর না হয় দুবার জন্ম হয় স্বীকার করলাম, কিন্তু মানুষের দুবার জন্ম হয় কেমন করে? মাতা পিতার ঔরসে তো সকলেরই জন্ম হয়ে থাকে, মানুষ প্রথমে প্রথমজ অর্থাৎ প্রথম

জন্ম, তারপর 'দ্বিজ' অর্থাৎ দ্বিতীয় বার জন্ম হয় কেমন করে? উত্তরে বলা হয়—প্রথমে মাতা-পিতা এবং দ্বিতীয়বার আচার্য দ্বারা জন্ম লাভ হয়, তাই তাকে বলা হয় 'দ্বিজ'। আচার্য তার যোগ্যতা অনুযায়ী বর্ণ দান করেন। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকালে বর্ণ নিরূপণের এরূপই ব্যবস্থা ছিল। সকলেই আপন আপন পুত্রদের গুরুকুলে পাঠাতো। পরে লেখাপড়া শিক্ষা করে যার যেমন যোগ্যতা হতো, তদনুসারে আচার্য তাদের বর্ণের উপাধি দিতেন।

কমলঃ তাহলে তুমি বলছ যে, ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের সন্তান শূদ্র হয় না? কেমন?

বিমলঃ এর কোনো মানে নেই যে, ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের সন্তান শূদ্রই হবে। ডাক্তারের সন্তান ডাক্তার এবং শিক্ষকের সন্তান শিক্ষক এবং উকীলের সন্তান উকীল হয় কি? কিন্তু তাতো হয় না। কেননা, পিতার ন্যায় যোগ্যতা যদি তার সন্তানের মধ্যে না থাকে তাহলে সে কী করে তার পিতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?

কমলঃ আমি তো সোজা-সুজি এই বুঝি, গাধার ঔরসে গাধা, এবং ঘোড়ার ঔরসে ঘোড়া, আম গাছে আম আর আপেল গাছে আপেল ফলে, তেমনি ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের ঔরসে শূদ্র জন্ম নেয়।

বিমলঃ আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে, গাধা এবং ঘোড়া এগুলি জাতি। জাতি হতে জাতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এগুলো বর্ণ,

তাই কর্মানুসারে এদের পরিবর্তন ঘটে। জাতির কোনো কালেও পরিবর্তন ঘটে না । যথা—গাধা কোনো কালেও ঘোড়া হবে না, এবং ঘোড়া কোনো কালেও গাধা হবে না । এরা যেমন তেমনই থাকবে ।

কমলঃ আমার বিবেচনায় বর্ণেরও কোনো কালেও পরিবর্তন ঘটে না । ভগবান যাদের যে যে বর্ণের করে পাঠিয়েছেন তারা সেই সেই বর্ণেরই থাকে।

বিমলঃ ভাল কথা বললে – বর্ণের কি কখনও পরিবর্তন ঘটে? তাই হোক? আচ্ছা—বলতো যদি বর্ণের পরিবর্তন না ঘটে, তাহলে এক ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কেমন করে মুসলমান বা খ্রীষ্টান হয়ে যায়? এই ভারতবর্ষের আট কোটি (লেখকের সময়কালে) মুসলমানের মধ্যে ৮০ ভাগ এমন আছে যারা হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছে । অথচ এদের মধ্যে চার বর্ণের অস্তিত্ব ঠিকই আছে । এবার বলো এদের পরিবর্তন ঘটল কেমন করে? বর্ণ যদি ভগবানের তৈরীই হয়ে থাকে, তাহলে তাতে পরিবর্তন হয় কেমন করে? বর্ণ যদি ভগবানের তৈরীই হয়ে থাকে, তাহলে তাতে পরিবর্তন হওয়া উচিত নয় । ভেবে দ্যাখো, ভগবানের তৈরী আম কোনো দিন কোথাও কোনো কালে কি কাঁঠাল হয়েছে? ভগবানের তৈরী সিংহ কোনো দিন হাতি হয়েছে কি? জগতের কোনো বস্তুকে দেখ না কেনো, সবই অপরিবর্তনীয়। ব্রাহ্মণ যদি ভগবানের তৈরী হতো, তাহলে সে ব্রাহ্মণই থাকতো এবং মুসলমান মুসলমানই থাকতো । কিন্তু তেমনটিতো হয় না।

গুণ ও কর্ম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ থাকে না এবং মুসলমানও মুসলমান থাকে না।

কমলঃ দাদা ! ব্রাহ্মণ তো ব্রাহ্মণই থাকে, সে মুসলমান হয়েই যাক আর খ্রীষ্টানই হয়ে যাক । হ্যাঁ, একথা বলা যায় যে, ব্রাহ্মণ এবার মুসলমান, খ্রীষ্টান হয়ে গেলে যে কাজের জন্য তাঁদের জন্ম, তারা আর সে কাজের যোগ্য থাকে না। যেমন নাকি সন্দেশ । সন্দেশ যদি একবার নালীতে পড়ে যায়,—সে সন্দেশ, সন্দেশ থাকে ঠিকই, কিন্তু সে আর খাদ্য হিসাবে ব্যবহারযোগ্য থাকে না ।

বিমলঃ চমৎকার ! তুমি কি অপূর্ব তর্ক তুলেছ ! ব্রাহ্মণ সে মুসলমান বা খ্রীষ্টান হয়ে গেলেও সে ব্রাহ্মণই থাকে ! ভাল কথা । যদি এই সত্য হয়, তাহলে তাকে ব্রাহ্মণই বা বলছো না কেনো? তাকে মুসলমান বা খ্রীষ্টান বলছো কেনো? তাকে মুসলমান ব্রাহ্মণ বা খ্রীষ্টান ব্রাহ্মণও তো বলা যেতে পারে? তা বলছো না কেনো? সন্দেশের উপমাও চমৎকার । বলতো, সন্দেশ নালীতে পড়ে গেলে, সে সন্দেশ ব্যবহার যোগ্য থাকে না, কিন্তু যদি কোনো পিতার পুত্রটি নালাতে পড়ে যায়, তাহলে সে পুত্র কি পিতার কাজের যোগ্য থাকে,— না থাকে না? যদি কারো গরু বা ঘোড়া নালাতে পড়ে যায় তাহলেও সেও কি কাজের যোগ্য থাকে,—না থাকে না? আর এক উদাহরণ দিচ্ছি শোনো । যদিও কারো সোনার চুড়ি নালাতে পড়ে যায়, তাহলে সেই চুড়িগুলো কোনো কাজের থাকবে,–না, থাকবে না? একথা সত্য যে, সন্দেশ নালাতে পড়ে গেলে সন্দেশ,

সন্দেশই থাকে। কেনো না, যার যেমন আকৃতি তেমনি থাকবেই। একথা সত্য নয় যে নালাতে যাই পড়ুক না কেনো, সে আর কোনো কাজে লাগবে না। সন্দেশ নালাতে পড়লে খাদ্যের অযোগ্য হতে পারে কিন্তু টাকা-পয়সা নালাতে পড়লে নিশ্চয়ই আর অব্যবহার্য থাকে না। সন্দেশের উদাহরণ বর্ণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। যথা—নালাতে সন্দেশ পড়ে গেলে যেমন সন্দেশ সন্দেশই থাকে, সে জিলিপী হয়ে যায় না, তেমনি নালাতে মানুষ পড়ে গেলে মানুষ, মানুষই থাকে সে গাধা বা ঘোড়া হয়ে যায় না। যার যা সৃষ্ট আকৃতি তার পরিবর্তন হবে কেমন করে? জাতি এবং বর্ণে মাত্র এই পার্থক্য যে, জাতি আকৃতি দ্বারা এবং বর্ণ গুণ কর্ম দ্বারা প্রমাণিত।

কমলঃ তবে কি আকৃতি দ্বারা বর্ণের পরিচয় পাওয়া যায় না?

বিমলঃ না, কখনই না। বর্ণ,–গুণ ও কর্ম দ্বারা জানা যায়। যদি আকৃতি দ্বারা তা জানা যেতো, তাহলে জিজ্ঞাসা করে জানবার কী প্রয়োজন ছিল যে, "তুমি কোন বর্ণের" তুমি 'ব্রাহ্মণ' না, 'ক্ষত্রিয়'? আসল কথাই তো এখানেই। এই কথা দ্বারাই তো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বর্ণ জন্ম দ্বারা নির্মিত নয়, কর্ম দ্বারা নির্মিত। ঈশ্বর যদি জন্ম দ্বারা বর্ণ তৈরী করতেন, তাহলে পরিচয়ের জন্য তাতে কোনো না কোনো পার্থক্য অবশ্যই রেখে দিতেন। ঈশ্বরকৃত যত পদার্থ ইহজগতে দেখা যায়, তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে তাদের আপন আপন পরিচয়ের জন্য সেই সমস্ত পদার্থে আকৃতিগত ভেদ রেখেছেন। শ্রেণীবদ্ধ ভাবে হাতি, ঘোড়া, উট, মেষ,

হরিণ, শূকর, টিয়া, পায়রা প্রভৃতি পশু-পাখীদের দাঁড় করিয়ে দাও, দেখবে একটা ছোট ছেলে সেও তাদের আকৃতিগত ভেদ দেখে বলে দেবে—এটা "গরু" এটা "ঘোড়া", এটা "হাতি"। একই স্থানে আপেল, কমলালেবু, আম, পেয়ারা, ডালিম প্রভৃতি ফল রেখে দাও। প্রত্যেক মানুষ তাদের আকৃতি দেখে বলে দেবে—কোনটা আম, কোনটা ডালিম, কোনটা পেয়ারা, কোনটা কমলালেবু। কিন্তু যদি চার বর্ণের দু'হাজার মানুষকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে অপরিচিত মানুষ তাদের দেখে কখনও বলতে পারবে না যে, তারা সকলে কে কোন বর্ণের।

কমলঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এদের রূপ বা রঙ দেখে মোটেই জানা যায় না? আমি তো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বিদ্বান ব্যক্তিদের কাছে শুনেছি "বর্ণ" ঈশ্বর কৃত।

বিমলঃ আবার সেই কথা ! আমি পূর্বেই বলেছি। বর্ণ কর্মাশ্রিত, জন্ম বা রূপ, রঙের আশ্রিত নয়। যদি রূপ ও রঙ দেখে বর্ণের পরিচয় পাওয়া যেতো তাহলে ব্রাহ্মণের রঙ ফর্সা হতো, ক্ষত্রিয়ের রঙ লাল হতো, বৈশ্য কালো রঙের হোতো। কিন্তু তা তো হয় না। কাশ্মীরের মেথর এবং মাদ্রাজের ব্রাহ্মণকে পাশাপাশি রেখে পরখ করে দেখো। মেথর ফর্সা এবং সুন্দর, আর ব্রাহ্মণ লোহার চাটুর চেয়েও কালো। ব্যঙ্গ করে বলতে শোনা যায়— "একবারে কালো চাটু" এই নিয়ে মাদ্রাজের ব্রাহ্মণদের মধ্যে মকদ্দমা লেগে যায়। ব্রাহ্মণ বলে আমি ঘোর কালো, আর লোহার

চাটু বলে— আমিই ঘোর কালো। বিচারক ব্রাহ্মণের পক্ষে রায় দিলেন। দ্যাখো ! কোয়েটা এবং বিহারের ভূমিকম্পে শত শত কচি-কচি ছেলে বাড়ীর নীচে চাপা পড়ায় মাটির নীচে থেকে তাদের বাহির করা হলো। সেই সব কচি ছেলেদের মধ্যে নানা বর্ণের ছেলে ছিল। তাদের মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন কারো কোনো খোঁজ ছিল না। বলতো, তাদের কোন বর্ণের মধ্যে গণ্য করা হবে? যদি রূপ, রঙ এবং আকৃতি ও সৌন্দর্যের আধারে বর্ণ প্রমাণিত হতো, তাহলে গরু ও ঘোড়ার বাচ্চার মত তাদেরও চিনে ফেলা যেতো, তারা কে কোন বর্ণের?

তুমি নিশ্চয়ই প্রকাণ্ড বিদ্বান ব্যক্তিদের নিকট অনেক কথা শুনে থাকবে। আমি তো কখনই বলিনি যে, তুমি শোনো নাই। শোনা তো সবই যায়, কিন্তু সত্য সেইটাই, যেটা দুই আর দুই-এ, চার যোগফলের মত সত্য। দ্যাখো, ঈশ্বর যদি জন্মের আধারে বর্ণ ব্যবস্থা করতেন, এরং কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য না রাখতেন, আর শুধু এইটুকু করতেন ব্রাহ্মণের শরীর লম্বায় আট ফুট হবে, ক্ষত্রিয়ের ছয় ফুট, বৈশ্যের হবে চার ফুট, তাহলে সঠিক পরিচয় পাওয়া যেতো, অথবা যদি তিনি শারীরিক তারতম্য করে দিতেন তাহলেও বুঝতে পারা যেতো সঠিক পরিচয় পেতে কোনো অসুবিধা হতো না।

ব্রাহ্মণের শরীরকে করতেন চার মণ ওজনের, ক্ষত্রিয়ের তিন মণ। বৈশ্যের দু’মণ আর শূদ্রের এক মণ করতেন, যাতে নাকি মানুষের বর্ণের পার্থক্য জানা যেতো। কিন্তু তিনি যে, মানবজাতির উন্নতিকল্পে গুণ ও

কর্মানুসারে বর্ণ ব্যবস্থা করার উপদেশ দিয়েছেন, তিনি ঐ বিষয়ে পার্থক্য রাখবেনই বা কেনো?

কমলঃ আচ্ছা, এই সব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি বর্ণের মধ্যে সব চেয়ে কোন বর্ণ বড়?

বিমলঃ বর্ণ কেহই ছোট বড় নয়। আপন আপন কর্তব্য কর্মে সকলেই বড়। যথা—শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ। বিচার-বিবেকের সময় "মস্তক' বড়, যখন রক্ষার সময় আসে তখন "হাত" বড়, যখন খাদ্যকে জানবার এবং শরীরের সঙ্গে যথাযোগ্য খাদ্য সার পাঠবার সময় আসে তখন "পেট" বড় এবং যখন পরিশ্রম দ্বারা শরীরের ভার বহনের বা গমনাগমনের সময় আসে তখন "পা" বড় হয় । এইভাবে মানুষের যখন সমাজকে জ্ঞানের দ্বারা সেবা করার সময় আসে তখন "ব্রাহ্মণ" বড় । যখন বল দ্বারা সেবা করার সময় আসে তখন "ক্ষত্রিয়" বড় । যখন ধন দ্বারা সেবা করার সময় আসে তখন "বৈশ্য' বড় এবং যখন শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সেবা করার সময় আসে তখন "শূদ্র" বড় । বাস্তবিক পক্ষে স্বতন্ত্র রূপে বর্ণের মধ্যে পরস্পর কেহ কাহারও অপেক্ষা বড়ও নয়, ছোট ও নয় ।

কমলঃ আমি ভাবতাম কী জানো? বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সব চেয়ে বড়, তার ছোট ক্ষত্রিয়, তার ছোট বৈশ্য আর সব চেয়ে ছোট শূদ্র ।

বিমলঃ না, একথা ঠিক নয় । স্বতন্ত্ররূপে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়দের মধ্যে, বৈশ্য বৈশ্যদের মধ্যে এবং শূদ্র শূদ্রদের মধ্যে যোগ্যতা

অনুসারে ছোট বড় থাকতে পারে, কিন্তু স্বতন্ত্র রূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি বর্ণের মধ্যে ছোট বড়ো সম্বন্ধ কী করে থাকতে পারে? যেমন নাকি— দু'জন ময়রা। একজন পারিশ্রমিক নেয় দু'টাকা প্রতিদিন, আর একজন নেয় চার টাকা। এদের মধ্যে কাকে বড় মানা যেতে পারে কী হিসাবে? না, কাজ হিসাবে। একজন ভাল কারিগর হিসাবে বড়, আর একজন মন্দ কারিগর হিসাবে ছোট। কিন্তু যদি কেহ বলে, ময়রা বড় না দর্জি? দর্জি পাঁচ টাকা রোজ নেয় অতএব দর্জি বড়। এদের মধ্যে কোথায় ময়রা আর কোথায় দর্জি? ময়রা আপন ক্ষেত্রে বড়। আপন আপন কর্তব্য কর্মে উভয়েই বড়। হ্যাঁ, দর্জিদের মধ্যে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী অবশ্যই বড় ছোট স্বীকার্য। ঠিক তেমনি যোগ্যতা অনুসারে একই বর্ণের দুই ব্যক্তির মধ্যে ছোট বড় থাকা সম্ভব কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যে ছোট বড়র কোনো সম্বন্ধই থাকতে পারে না। কেননা, তাদের গুণ কর্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। সেক্ষেত্রে সকলেই আপন আপন কর্তব্য পালনে বড়,— ছোট কেহই নয়।

কমলঃ বর্ণ ব্যবস্থা কি অন্যান্য দেশেও আছে?

বিমলঃ জগতের সর্বত্র গুণ কর্মানুসারে বর্ণ ব্যবস্থা আছে। একথা অবশ্য পৃথক যে, তাদের নাম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র না হয়ে মিশনারী (Misionary), মিলিটারী (Military), মার্চেন্ট (Merchant) এবং মিনিয়াল (Menial) রাখা হয়েছে। এই শ্রম বিভাগ বা কর্ম বিভাগের

(divi sion of Labour) সিদ্ধান্ত, সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। এরই নাম বর্ণ ব্যবস্থা।

কমলঃ দাদা, এবার বুঝেছি আপনার অপার অনুগ্রহ। আর এক কথা, নমস্তে শব্দটা কোথা হতে প্রচলন হলো?

বিমলঃ এ বিষয়ে আগামীকাল বলব। এখন শোনো -

অধ্যাপনমধ্যয়নং য়জনং য়াজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥ মনু০ ১/৮৮॥

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥ মনু০ ১/৮৯॥

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ।। মনু০ ১/৯০।।

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণনাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥ মনু০ ১/৯১॥

[মূল বইয়ে অধ্যায়টি এখানেই সমাপ্ত]

[নতুন সংস্করণে কিছু অতিরিক্ত নিবেদন]

মূল বইয়ে লেখক শেষে শুধুমাত্র মনুস্মৃতির ১ম অধ্যায়ের ৮৮-৯১ নং শ্লোকে উল্লেখ থাকা চার বর্ণের কর্মের উল্লেখ করেছেন, তাও শুধুমাত্র মনুস্মৃতির বচনগুলো। আমি এখানে নবীন স্বাধ্যায়ীদের সুবিধা বিবেচনা করে নিজ উদ্যোগে এর অর্থ ও সাথে গীতার আরো দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি এবং ভাষ্য হিসেবে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ও ড.সুরেন্দ্রকুমারের ভাষ্যকে উদ্ধৃত করছি। এতে করে সবার চারবর্ণের কর্ম সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে।

সমাজে মানুষের মাঝে কর্মবিভাগ করার জন্যই চারবর্ণের ধারণাটি ঈশ্বর প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু কাউকে কোনো নির্দিষ্ট বর্ণের করে পাঠাননি। এই চারবর্ণ নির্ণিত হয় মানুষের অর্জিত গুণ ও কর্মের সামর্থ্য দ্বারা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে বর্ণের গুণ অর্জন করতে সক্ষম হবে ও যে বর্ণের নির্দিষ্ট কর্ম করার সামর্থ্য অর্জন করবে সে সেই বর্ণেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। এই ধারণারই উল্লেখ আমরা পাই শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৪/১৩ শ্লোকে-

শ্রীভগবান এখানে বলছেন,

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ"

অর্থাৎ গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি চার বর্ণের সৃষ্টি করেছি।

সুতরাং গীতার এই সিদ্ধান্ত আমাদের জানাচ্ছে, বর্ণ নির্ধারিত হবে ব্যক্তির কর্ম ও গুণ দ্বারা। সে কোন বর্ণের পিতামাতার ঘরে জন্মেছে তা দ্বারা নয়। এবার আমাদের জানতে হবে চারবর্ণের কর্মগুলো সম্পর্কে -

ব্রাহ্মণ বর্ণের কর্মঃ-

অধ্যাপনমধ্যয়নং য়জনং য়াজনং তথা।

দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥

মনু০ ১/৮৮॥

→ ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজ্ঞ করা ও করানো, দান দেওয়া এবং দান গ্রহণ করা এই ছয়টি কর্ম। কিন্তু "প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ" অর্থাৎ প্রতিগ্রহ (গ্রহণ করা) হীন কর্ম॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরাজবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥

(শ্রীমদভগবদগীতা ১৮/৪২)

→(শম) মনে মনে কুকর্ম করিবার ইচ্ছাও না করা এবং মনকে কখনও অধর্মে প্রবৃত্ত হইতে না দেওয়া। (দম) শোত্র ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে অন্যায় আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্মে পরিচালিত করা। (তপ) সর্বদা ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্মানুষ্ঠান করা।

শৌচ—

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।

বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥

মনু০ ৫/১০৯॥

জল দ্বারা বহিরঙ্গ, সত্যাচরণ দ্বারা মন, বিদ্যা ও ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবাত্মা এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি পবিত্র হয়। অভ্যন্তরীণ রাগদ্বেষাদি দোষ এবং বাহিরের মল দূর করিয়া শুদ্ধ থাকা, অর্থাৎ সত্যাসত্য বিচার করিয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্যবর্জন দ্বারা নিশ্চয়ই পবিত্র হওয়া যায় ; (ক্ষান্তি) অর্থাৎ নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, হানি-লাভ, মান-অপমানাদি, হর্ষ-শোক পরিত্যাগ করিয়া ধর্মে দৃঢ়নিশ্চয় থাকা ; (আর্জব) কোমলতা, নিরভিমানতা, সরলতা ও সরল স্বভাব রাখা এবং কুটিলতাদি দোষ পরিত্যাগ করা ; (জ্ঞান) সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপনা করিবার সামর্থ্য, বিবেক ও সত্য নির্ণয়, যে বস্তু যেমন, তাহাকে সেইরূপ জানা অর্থাৎ জড়কে জড় এবং চেতনকে চেতন জানা ও স্বীকার

করা। (বিজ্ঞান) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্যন্ত যাবতীয় পদার্থকে বিশেষ রূপে জানিয়া ঐ সকলকে যথোচিত কার্য্যে প্রয়োগ করা। (আস্তিক্য) বেদ, ঈশ্বর ও মুক্তিতে বিশ্বাস; পূর্ব পরজন্ম স্বীকার করা; ধর্ম, বিদ্যা ও সৎসঙ্গ; এবং মাতৃ পিতৃ ও অতিথি সেবাকে কখনও পরিত্যাগ না করা এবং কখনও নিন্দা না করা এই পঞ্চদশ কর্ম ও গুণ ব্রাহ্মণ বর্ণস্থ মনুষ্যের মধ্যে অবশ্যই থাকা উচিত ॥

ক্ষত্রিয় বর্ণের কর্মঃ-

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।

বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥

মনু০ ১/৮৯॥

→(প্রজা০) ন্যায়ানুসারে 'প্রজারক্ষা' অর্থাৎ পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্বক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মান এবং দুষ্ট ব্যক্তিদের তিরস্কার করা; সর্বপ্রকারে সকলকে পালন করা, (দান) বিদ্যাধর্মে প্রবৃত্তি ও সুপাত্রের সেবায় ধনাদি সামগ্রী ব্যয় করা। (ঈজ্যা) অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করা ও করান। (অধ্যয়ন) বেদাদি শাস্ত্র সমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা; (বিষয়েস্ব প্রসক্তি) বিষয়সমূহে আসক্ত না হইয়া সর্বদা জিতেন্দ্রিয় এবং শরীর ও আত্মায় বলবান থাকা।

শৌয়ং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।।

(শ্রীমদভগবদগীতা ১৮/৪৩)

(শৌর্য্য) একাকী শত সহস্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করিতে ভীত না হওয়া (তেজঃ) সর্বদা তেজস্বী অর্থাৎ দীনতাশূণ্য প্রগল্ভ এবং দৃঢ় থাকা। (ধৃতি) ধৈর্য্যবান হওয়া। (দাক্ষ্য) রাজা-প্রজা বিষয়ক ব্যবহার এবং সকল শাস্ত্রে অতিশয় নিপুণ হওয়া (যুদ্ধে) যুদ্ধে দৃঢ় ও নিঃশঙ্ক থাকিয়া, কখনও তাহাতে পরাঙ্মুখ না হওয়া ও পলায়ন না করা; অর্থাৎ এইরূপ যুদ্ধ করা যাহাতে নিশ্চিতরূপে বিজয় হইবে এবং আত্মরক্ষা করিবে। যদি পলায়ন বা শত্রু প্রতারণা করিলে বিজয় লাভ হয়, তবে তাহাও করা। (দান) দানশীল থাকা (ঈশ্বরভাব) পক্ষপাতশূন্য হইয়া সকলের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করা, বিচারপূর্বক দান করা, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা এবং কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হইতে দেওয়া। এই একাদশটি ক্ষত্রিয়বর্ণের কর্ম এবং গুণ॥

বৈশ্য বর্ণের কর্মঃ-

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।

বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ।।

মনু০ ১/৯০।।

→(পশুরক্ষা) গবাদি পশুর পালন এবং বৃদ্ধি করা। (দান) বিদ্যা ও ধর্মের বৃদ্ধি করিতে ও করাইতে ধনসম্পত্তি ব্যয় করা। (ইজ্যা) অগ্নিহোত্রদি যজ্ঞ করা। (অধ্যয়ন) বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করা। (বণিকপথ) সর্বপ্রকার বাণিজ্য করা। (কুসীদ) শতকরা চারি আনা, ছয় আনা, আট আনা, বার আনা, ষোল আনা, বা বিশ আনার অধিক সুদ গ্রহণ না করা এবং মূলধনের দ্বিগুণের অধিক অর্থাৎ এক টাকা দিয়া একশত বৎসরের দুই টাকার অধিক গ্রহণ না করা ও না দেওয়া। (কৃষি) কৃষিকার্য্য করা। এই [সাতটি] বৈশ্যের গুণ ও কর্ম।

শূদ্র বর্ণের কর্মঃ-

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।

এতেষামেব বর্ণনাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥

মনু০ ১/৯১॥

→পদার্থ+ভাবার্থঃ- (প্রভুঃ) পরমেশ্বর (শূদ্রস্য) যে বিদ্যাহীন – যাহার পড়া লেখা দ্বারা বিদ্যা অর্জন হয় না, শরীর পুষ্ট, সেবায় কুশলি সেই শূদ্রের জন্য (এতেষামেব) এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণের

(অনসূয়য়া) নিন্দারহিত প্রীতি দ্বারা (শুশ্রূষাম্) সেবা করা (একমেব কর্ম) এই এক কর্ম (সমাদিশত্) করার আজ্ঞা দিয়েছেন।

[এই শ্লোক নিয়ে অনেকে অপপ্রচার করে বলে পদার্থসহ দেয়া হলো। যাতে মূল শ্লোক নিয়ে সন্দেহ না থাকে।]

[এবারে আরো কিছু মূল্যবান তথ্য পিডিএফ নির্মাতা কর্তৃক, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী লিখিত সত্যার্থ প্রকাশ থেকে নিম্নে উল্লেখ করা হলো]

যে যে ব্যক্তির মধ্যে যে যে বর্ণের গুণ-কর্ম্ম থাকিবে সেই সেই ব্যক্তিকে সেই সেই বর্ণের অধিকার দান করিবে। এইরূপ ব্যবস্থা রাখিলে সব মনুষ্য উন্নতিশীল হয়। কারণ উত্তম বর্ণের ভয় হইবে যে, তাহার সন্তান মূর্খত্বাদি দোষ যুক্ত হইলে শূদ্র বলিয়া গণ্য হইবে। সন্তানদের ভয় থাকিবে যে, তাহারা পূর্বোক্ত আচার-ব্যবহার ও বিদ্যাসম্পন্ন না হইলে তাহাদের শূদ্র হইতে হইবে। আর নিম্ন বর্ণেরাও উচ্চ বর্ণস্থ হইবার জন্য উৎসাহ পাইবে।

বিদ্যা এবং ধর্ম প্রচারের অধিকার ব্রাহ্মণকে দিবে। কারণ, তাঁহারা পূর্ণ বিদ্বান্ এবং ধার্মিক বলিয়া সেই কার্য্য যথোচিত রূপে সম্পাদন করিতে

পারেন। ক্ষত্রিয়কে রাজাধিকার দান করিলে রাজ্যের কখনও হানি অথবা বিঘ্ন হয় না।

পশুপালন প্রভৃতি অধিকার বৈশ্যকেই দান করা উচিত। কারণ তাঁহারা এ কার্য্য উত্তমরূপে করিতে পারে।

শূদ্রকে সেবাধিকার দানের কারণ এই যে সে বিদ্যাহীন এবং মুর্খ [কারন যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসম্পন্ন করতে পারে না অথবা বিভিন্ন ধরণের দুর্গুন ধারণ করে তাদেরকে শুদ্র বলা হয়] বলিয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কার্য্য কিছুই করিতে পারে না। কিন্তু সে শারীরিক কার্য্য সবই করিতে পারে। এইরূপ সকল বর্ণকে স্ব স্ব অধিকারে প্রবৃত্ত করা রাজাদের কর্তব্য।

এখন কর্ম অনুযায়ী যে মানুষের বর্ণ পরিবর্তন হয় তার প্রমাণ হিসেবে কিছু বচন নিচে একই সূত্র থেকে দেয়া হলো-

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।

ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবস্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ ॥

মনু০ ১০/৬৫

অর্থাৎ, যদি কেহ শুদ্রকুলে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের গুণ-কর্ম-স্বভাব বিশিষ্ট হয় তবে সে শূদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য হইবে। সেইরূপ, কেহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অথবা বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের গুণ-কর্ম-স্বভাব বিশিষ্ট হইলে সে শূদ্র হইবে। এইরূপ কেহ ক্ষত্রিয়

বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ অথবা শুদ্র সদৃশ হইলে, ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্রই হইয়া যায়। অর্থাৎ যে পুরুষ বা স্ত্রী, চারি বর্ণের মধ্যে যে বর্ণের সদৃশ হইবে, সে সেই বর্ণেরই হইবে।

আবার-

ধর্মচর্য়য়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্বং পূর্বং

বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ ॥১০॥

অধর্মচর্য্যয়া পূর্বোবর্ণো জঘন্যং জঘন্যং

বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ ॥১১॥

আপস্তম্ব ধর্মসূত্র (প্র. ২ পটল ৫ খং. ১১ সূত্র.১০-১১)

অর্থ – ধর্মাচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট বর্ণ স্ববর্ণ অপেক্ষা উচ্চ বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং যে যে বর্ণের উপযুক্ত সে, সেই বর্ণে গণ্য হইবে॥১০॥

সেইরূপ অধর্মাচরণ দ্বারা পূর্ব পূর্ব অর্থাৎ উচ্চবর্ণের মনুষ্য নিজ বর্ণ অপেক্ষা নিম্ন বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সে সেই বর্ণে গণ্য হইবে॥১১॥

পুরুষেরা যেমন স্ব স্ব বর্ণের যোগ্য হয় তেমন স্ত্রীলোকের ব্যবস্থাও বুঝিতে হইবে। এতদ্বারা সিদ্ধ হইল যে, এইরূপ ব্যবস্থা হইলে সকল বর্ণ নিজ নিজ গুণ-কর্ম-স্বভাববিশিষ্ট হইয়া শুদ্ধতার সহিত থাকিবে।

-সত্যার্থ প্রকাশ, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী

ইতিহাসে আমরা বহু শূদ্রকুলে জন্মানো ঋষি দেখতে পাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচয়িতা ঋষি ঐতরেয়, ঋগ্বেদের অক্ষসূক্তের রচয়িতা ঋষি কবষ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে একটা বেদমন্ত্র উপস্থাপন করছি যেখানে ঈশ্বর স্পষ্ট ঘোষনা করছেন যে মানুষের মাঝে কোন ছোট বড় নেই। এ দ্বারা বোঝা যাবে যারা বর্ণের মধ্যে ছোটবড় খোজেন তারা বেদবিরোধী।

অজ্যেষ্ঠাসো অকণিষ্ঠাস এতে সং ভ্রাতরো বাবৃধুঃ সৌভগায়।

যুব পিতা স্বপা রুদ্র এযাংসুদুঘা পৃশ্নিঃ সুদিনা মরুদ্ভঃ ॥

(ঋগ্বেদ ৫/৬০/৫।)

→মনুষ্যের মধ্যে কেহ বড় নয় বা কেহ ছোট নয়। ইহারা ভাই ভাই। সৌভাগ্য লাভের জন্য ইহারা প্রযত্ন করে। ইহাদের পিতা তরুণ শুভকর্ম ঈশ্বর এবং মাতা দুগ্ধবতী প্রকৃতি। প্রকৃতি মাতা ক্রন্দনহীন পুরুষার্থী সন্তানকেই সুদিন প্রদান করে।

উপরে আলোচনায় মোটামুটি স্পষ্ট যে, যাঁহারা মস্তিষ্ক বা বুদ্ধিবল দ্বারা সমাজ সেবা করেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ হলো সমাজের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। যাঁহারা বাহুবল দ্বারা সমাজ সেবা করেন তাঁহারা ক্ষত্রিয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হলো শাষক ও সৈনিক বা প্রশাসনের সাথে জড়িত সম্প্রদায়। যাঁহারা কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য দ্বারা সমাজের পুষ্টি সাধন করেন তাঁহারা বৈশ্য অর্থাৎ বৈশ্য হলো ব্যাবসায়ী ও কৃষিজীবি সম্প্রদায় এবং যাঁহারা সমাজের পাদ, ভিত্তি বা আশ্রয় স্বরূপ তাঁহারা শূদ্র অর্থাৎ শূদ্র হলো শ্রমজীবি সম্প্রদায়।

যেকোন এক সম্প্রদায়কে ছাড়া সমাজ অচল আবার শ্রমিকের সন্তানও যেমন লেখাপড়া শিখে সমাজে বুদ্ধিজীবি হিসেবে গৃহীত হয় আবার বুদ্ধিজীবির মাদকাসক্ত সন্তান যেমন সমাজে কোন সন্মানের পাত্র হয়না বরং অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয় তেমনি ব্যাবস্থা চার বর্ণেও।

সুতরাং বর্ণব্যাবস্থা শুধুমাত্র মানুষের মাঝে স্বীয় গুণানুযায়ী কর্মের বিভাজনের জন্য ঈশ্বর দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে পরবর্তীতে মুনি ঋষিরাও সেভাবেই বিস্তার করেছেন এবং মানুষ তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন বর্ণে স্থান পেয়েছে। কিন্তু পরিশেষে একদল স্বার্থান্বেষী মহল কর্ম অনুযায়ী বর্ণব্যাবস্থাকে জন্মানুযায়ী করেছে এবং একে ব্যাবহার করে মানুষকে শোষণ করেছে। তাই আমাদের উচিত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং কোন ব্যক্তির মনগড়া নিয়ম না মেনে শাস্ত্রীয় নির্দেশ মেনে চলা।

“নমস্তে” - কোথা হতে এল?

(দশম দিন)

কমলঃ দাদা ! আচ্ছা, নমস্তে কোথা হতে এলো, এর মানেই বা কী, বল তো?

বিমলঃ সৃষ্টির আদি হতে মহাভারতের যুগ পর্যন্ত সকলে পরস্পরকে নমস্তে করতেন। তারপর যখন থেকে মতামতান্তর এবং অনেক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে, সেই সময় তারা পরস্পর সম্মান প্রদর্শনার্থে পৃথক পৃথক শব্দ স্থির করে নেয়। কেহ ‘গুড মর্ণিঙ’, ‘গুড নাইট’, ‘গুড বাই’, কেহ ‘আস্লাম্ অলৈকম্’, ‘ওআলে কম্ সালাম’, ‘আদাব অর্জ' ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দ বিধর্মীগণ এবং বিদেশীরা কল্পনা করে নেয় । হিন্দুদের মধ্যেও মত ও পন্থবাদীরা অনেক শব্দ কল্পনা করেছে, কেউ ‘জয় শিব’, ‘জয় হরি’, ‘জয় গোবিন্দ’, ‘জয় রাধেশ্যাম’, ‘জয় রামজী’, ‘জয় কৃষ্ণজী কী’, ‘প্রনাথ’, ‘জুহার' প্রভৃতি অনেক সম্ভাষণ — শব্দ প্রয়োগ করে থাকে। মহাভারতের পূর্বে ভূমণ্ডলে আর্যদের অখণ্ড রাজ্য ছিল । মানুষ সকলেই ছিল বৈদিক ধর্মাবলম্বী, তারা পরস্পর নমস্তেই করত। বর্তমান যুগে ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতীর কৃপায় মানুষ প্রাচীন বৈদিক সিদ্ধান্তকে আবার হৃদয়ঙ্গম করতে লাগল । আর সেই সঙ্গে সবাই

'নমস্তে' করা আরম্ভ করল। তুমি যে প্রশ্ন করলে "নমস্তে শব্দের অর্থ কী?" সেই কথাই বলছি — নমস্তে অর্থাৎ আমি তোমায় মান্য করি– তোমার সমাদর করি।

কমলঃ বেদে কি 'নমস্তে' শব্দ আছে? নমস্তে না বলে যদি 'জয় রামজী কী', 'জয় শ্রীকৃষ্ণজী কী' বলা যায়, তাতে দোষ কী?

বিমলঃ বেদেই কেনো, বাল্মীকীর রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থে 'নমস্তে' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণের কোথাও 'জয় রামজী কী' মহাভারতের কোথাও 'জয় কৃষ্ণজী কী', তাছাড়া আর্য শাস্ত্রে 'জয় শিব' ও নেই, "জয় শঙ্কর"-এর উল্লেখও নেই, শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নমস্তে করতেন কেননা, তাঁরা সকলেই বৈদিক ধর্মাবলম্বী। দ্যাখো ভাইটি ! যদি তোমায় কেহ প্রশ্ন করে যে শ্রীরাম এবং কৃষ্ণের জন্মের পূর্বে মানুষ কী বলে সম্ভাষণ জানাতো—তুমি কী উত্তর দেবে? প্রায় দশলক্ষ বৎসর পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হয়, আর প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর হলো শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। সৃষ্টি এরও প্রায় পৌনে অর্বুদ বৎসর পূর্বে হয়েছে। আমি তোমায় বলেছি এ সমস্ত সাম্প্রদায়িক মানুষের কল্পনা প্রসূত শব্দ। তোমার কথা হলো যদি 'জয় রামজী' বা 'জয় কৃষ্ণজী' বলা হয় তাতে ক্ষতি কী? ক্ষতি একটা নয় বহু।

■ প্রথমতঃ — মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবনা জাগ্রত হয়।

■ দ্বিতীয়তঃ — ঐ সমস্ত কাল্পনিক সম্ভাষণিক শব্দ ব্যবহার করলে পরস্পর সম্মানের কোনো ভাব মনে জাগ্রত হয় না, মানব সমাজ বয়সে কেউ একজন অপেক্ষা অপর জন বড়, কেউ বা বয়সে ছোট, আবার কেউ বা বয়সে সমান। তাদের মধ্যে যখন একজন অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন একজন অপর জনের প্রতি আদর এবং সম্মানের ভাব প্রকাশ করা মানবতা এবং সভ্যতার চিহ্ন। সেইরূপ ভাব প্রকাশ না করে 'জয় রামজী কী', 'জয় কৃষ্ণজী কী', 'জয় শিব কী' বলা শোভা পায় না। মনে কর তুমি তোমার দিদিমা, মামীমা বা পিসীমাকে দেখে, তাদের উদ্দেশ্যে বললে—'জয় রামজী কী'।

এবার সত্যি করে বলতো — তুমি তাদের সম্মান প্রদর্শনার্থে কী বললে? কেননা 'জয় রামজী কী' বললে শ্রীরামের জয়, আর 'জয় কৃষ্ণজী কী' বললে – শ্রীকৃষ্ণের জয় বুঝা গেল। কেননা, 'জয় রামজী' বললে রামের জয় ঘোষণা, আর 'জয় কৃষ্ণজী কী' বললে কৃষ্ণের জয় ঘোষণা করা হয়। যার উদ্দেশ্যে 'জয় রামজী কী' বা 'জয় কৃষ্ণজী কী' বলা হলো এরূপ বললে তার প্রতি সম্মান দেখান হলো কোথায়? আর 'নমস্তে' বললে তার মানে কী হয়? 'আমি তোমার সম্মান করি'। 'আমি তোমার আদর করি'। ছোট, বড় ভেদ ভাব না রেখে পরস্পর 'নমস্তে' বলাই উচিত। ছেলে মেয়েদের আদর করি, গুরুজন বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতিও আদর করি, শিশুদের প্রতিও আদর, বড় ও কনিষ্ঠদের প্রতি আদর, মাতাপিতার প্রতি আদর, পুত্রকন্যার প্রতি আদর সম্মান অর্থাৎ 'নমস্তে'।

কমলঃ 'রাম কী জয়', 'কৃষ্ণ কী জয়' বললে শ্রীরাম ও কৃষ্ণের পবিত্র নাম জিহ্বাগ্রে গ্রহণ করা তো হয় এটা মন্দ কীসে?

বিমলঃ না, মন্দ আবার কীসে? নাম গ্রহণ হয় কেনো? এর কি কোনো বিশেষ প্রয়োজন আছে? একজন অপরজনকে সম্মান প্রদর্শনের সময় 'জয় রাম কৃষ্ণজী কী' বলতেই হবে? প্রত্যেক সময় কি একই শব্দ বলা সঙ্গত? বা অসময়ে শ্রীরাম-কৃষ্ণের জয় ঘোষণা করা মন্দ নয় কী? যেখানে শ্রীরাম এবং কৃষ্ণের চরিত্র বর্ণনা করা হচ্ছে, সেস্থলে রাবণ ও কংসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে শ্রীরাম এবং কৃষ্ণের জয় দেওয়া অতি উত্তম ও শোভন।

কমলঃ সকল সময় ভালো শব্দ বলা উচিত নয় বুঝি?

বিমলঃ যত সুন্দর শব্দই হোক না কেনো, তা যথা সময়ে বলা হলে তার শোভা বৃদ্ধি পায়। দ্যাখো ! 'বল হরি হরি বোল' কত সুন্দর বাক্য। কিন্তু সকল সময় ভাল লাগে কী? লাগে না। যদি সকল সময় এ বাক্য ভালই লাগতো, তাহলে একবার এই বোল বিবাহ বাসরে বলে দেখো, কত ভাল লাগে। এই বোল বলায় কত প্রশংসা কুড়োবার সৌভাগ্য লাভ করা যায় তা একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

কমলঃ তাহলে বুঝি প্রত্যেকে প্রত্যেককে নমস্তে করবে? ছেলে যদি বাবাকে নমস্তে করে তা অবশ্য খারাপ দেখায় না, ভালোই দেখায়। কিন্তু

বাবা যদি ছেলেকে নমস্তে করে, বা মেয়েকে নমস্তে করে বড় ছোটকে, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যকে নমস্তে করে, তা বিসদৃশ দেখায় না কি?

বিমলঃ আচ্ছা বলতো, মা'কে কারো ভালোবাসা উচিত কি না?

কমলঃ হ্যাঁ, ভালবাসা উচিত।

বিমলঃ নিজের বোনকে ভালবাসা উচিত কি না ?

কমলঃ হ্যাঁ, উচিত।

বিমলঃ নিজের মেয়েকে ভালবাসা উচিত কি না?

কমলঃ হ্যাঁ, ভালাবাসা উচিত।

বিমলঃ তাহলে এবার আমি জিজ্ঞাসা করি, সকলে সকলকেই ভালবাসবে, কিন্তু এ কেমন কথা হলো? মা'কেও ভালবাসবে, বোনকেও ভালবাসবে, মেয়েকেও ভালবাসাবে, স্ত্রীকেও ভালবাসবে, মানে—সবাইকে ভালবাসবে। এখানে দেখি সকলের পক্ষে একই শব্দ প্রযুক্ত করা হয়েছে। কী জানি এ কোন দেশের সভ্যতা প্রত্যেকের সঙ্গে ভালবাসা!

কমলঃ স্ত্রী, পুত্র, মা, বোন, মেয়ে, প্রভৃতির প্রতি ভালাবাসার ভাবনা তো পৃথক-পৃথক।

বিমলঃ হ্যাঁ ঠিক বলেছ। তেমনি নমস্তে করার ভাবনাও পৃথক পৃথক্। ছেলে মাতা-পিতাকে ভালবাসছে, এখানে ভালবাসার দ্বারা শ্রদ্ধা দেখান হচ্ছে। ভাই-বোনকে ভালবাসছে, এখানেও স্নেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। পতি

পত্নীর ভালবাসার মধ্যে আছে প্রণয়ের ভাবনা, আর যেখানে ভগবানকে ভালবাসা সেখানে ভক্তি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এইভাবে যেখানে পুত্র মাতা পিতাকে নমস্তে করছে, সেখানে স্নেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। ভাই-বোন যেখানে পরস্পর নমস্তে করছে, সেখানে পিতা পুত্র-কন্যাকে আশীর্বাদ দিচ্ছে, যখন সমবয়স্ক পরস্পর নমস্তে করছে, সেখানে ভালবাসা প্রকাশ করছে । গুরুজনদের প্রতি আদর, সমবয়স্কদের প্রতি ভালবাসা, কনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহ, এই সমস্ত ভাবনা 'নমস্তে' শব্দে নিহিত। এ ভাবনা থাকা সত্ত্বেও 'নমস্তে' শব্দের একমাত্র লক্ষ্য হল, প্রত্যেককে সমাদর ও শ্রদ্ধভক্তি করা। যথা— শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রণয় প্রভৃতি শব্দ প্রেম, ভালবাসারই তো অপর রূপ । তেমনি সমাদর, আশীবাদ, স্নেহ প্রভৃতিও 'নমস্তে' শব্দের আর একরূপ।

কমলঃ দাদা, তুমি আমার 'নমস্তে'র শঙ্কা নিবারণ তো ভালভাবেই করে দিলে। এবার বলো মানুষের পক্ষে মাংস খাওয়া উচিত,—না অনুচিত?

বিমলঃ এ বিষয়ে আগামীকাল বিবেচনা করা যাবে, আজ অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।

মাংস খাওয়া উচিত না, অনুচিত?

(একাদশ দিন)

কমলঃ মানুষের পক্ষে মাংস খাওয়া কি উচিত?

বিমলঃ না, মোটেই উচিত নয়।

কমলঃ কেনো?

বিমলঃ যেহেতু প্রাণীকে পীড়া না দিয়ে মাংস পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অকারণ কাউকেও কষ্ট দেওয়া মানুষের ধর্ম নয়।

কমলঃ সে ভাবে বিচার করলে তো, কারো শাক, প্রভৃতি ফল প্রভৃতি ও খাওয়া উচিত নয়, কেননা তাদের মধ্যেও জীবন আছে, তাদের কষ্ট দেওয়া হয়। বনস্পতির মধ্যেও যখন জীবন আছে, সে অবস্থায় তাদেরও কষ্ট দেওয়া হয় না বুঝি?

বিমলঃ তোমার জিজ্ঞাসার বিষয় ছিল, মাংস খাওয়া কি উচিত? আমি তার উত্তরে বলেছিলাম-খাওয়া উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে বৃক্ষ এবং বনস্পতিতে জীবন আছে, না নেই একথা আসে কেমন করে? আর যদি এই কথাই মেনে নেওয়া যায় যে', যাতে জীবন আছে তাতে মাংস আছে তাহলে প্রমাণ কর বৃক্ষ, এবং শাক ও ফলের মধ্যে মাংস কোথায় যে,

এগুলো অভক্ষ্য। শোনো ফল এবং সজ্জীতে রস থাকে, রক্ত ও মাংস থাকে না। কেননা, কাউকেও কি বলতে শুনেছ–"আমের মাংস" বা "লেবুর মাংসটা" একটু চেখে দ্যাখো, "আপেল ও কমলালেবুর মাংসটা বেশ ভাল হয়েছে।"

কিন্তু লোকে কী বলে? বলে—আমের রস আনো, কমলালেবুর রস করে দাও। 'রস' সে ফুলের হোক বা শাক সব্জীর অথবা আখের, তা পান করতে কোনো দোষ নেই। দোষ কেবল রক্ত ও মাংস ভক্ষণে। যেখানে দেখবে মাংস এবং রক্তের সম্বন্ধ সেখানেই প্রাণীর দুঃখ ক্লেশ। আর যেখানে 'রস' সেখানে দুঃখের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই। যে কোনো প্রাণধারীর 'রস' নিঃসরণের পর তাতে কোনো ক্লেশ বা কোনো দুঃখ হয় না। যথা— গোরস অর্থাৎ—গোদুগ্ধ। গোদুগ্ধ দোহনে গভীর কোনো দুঃখ হয় কী? যদি গাভীর ওলান 'গোরস' অর্থাৎ দুধে পরিপূর্ণ থাকে, আর তা দোহন করা না হয় তাহলে দেখা যাবে, গাভী 'হাম্বা' 'হাম্বা' করে চিৎকার করতে আরম্ভ করেছে। দুগ্ধভারে গাভী কষ্ট পাচ্ছে, এবার দুগ্ধ দোহন কর, গাভীর এই ইঙ্গিত আছে? কিন্তু যেখানে গরু বা অন্য কোনো পশুর মাংস বের করা হয় সেখানেই তাদের দুঃখ হয়।

কমলঃ যদি ফল ও শাক-সব্জীতে মাংস না থাকে, তাহলে তার মধ্যে যে শাঁস থাকে সেটা কী? সেইটাই তো মাংস।

বিমলঃ যদি ফল এবং শাক-সব্জীর শাঁসই মাংস হয়, তাহলে তো রসগোল্লা ও লেডিকেনীকেও মাংস বলা যেতে পারে। কেননা শাঁস তো

তাতেও থাকে। কিন্তু রসগোল্লাকে কে মাংস বলবে বল? বাস্তবিক পক্ষে মাংস তাকেই বলা হয়, যার মধ্যে রক্ত আছে। যেখানে রক্ত নেই সেখানে মাংস কোথায়? বৃক্ষ এবং ফল-ফুলের মধ্যে রস আছে, কিন্তু রক্ত নেই। যেখানে রক্তের অভাব সেখানে মাংসের অভাব হওয়াও স্বাভাবিক। দেহস্থিত ধাতুতে সর্ব প্রথম পাবে 'রস'। 'রস' থেকে রক্ত সৃষ্টি, এবং রক্ত থেকে 'মাংস' হয়। মাংস থেকে অন্যান্য ধাতুসমূহের সৃষ্টি। আজ যা ভোজন করবে তা পরিপাক হয়ে প্রথমে হবে 'রস', সেই রসথেকে হবে 'রক্ত' আর সেই রক্ত থেকে হবে মাংস। মাংস হলো তৃতীয় স্তর। ভগবান যখন প্রাণীর দেহে রস হতে রক্ত এবং রক্ত হতে মাংস নির্মাণের ব্যবস্থা করেছেন, সে অবস্থায় প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে রস সৃষ্টি করার এবং সেই রস হতে রক্ত ও রত্ত থেকে মাংস উৎপন্ন করা সৃষ্টি বিরুদ্ধক্রমের কাজ নয় কী?

কমলঃ তাহলে তো ডিম খেলে কোনো দোষ হওয়া উচিত নয়, কেননা ডিমে তো মাংস নেই, হ্যাঁ রস অবশ্যই আছে।

বিমলঃ ডিম রজঃবীর্যের সংযোগের পরিণাম রূপ পিণ্ড বিশেষ। সেই পিণ্ড হতেই রক্ত—মাংসময় প্রাণীর দেহ গঠিত। যে কোনো রক্ত, মাংসময় প্রাণীর ভিত্তিকে অনিষ্ট করা কি কোনো মানুষের ধর্ম হতে পারে? লোক যে ডিম খায় সেও তাদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে খায়। এ কাজ কখনও করা উচিত নয়।

কমলঃ আমি তো দেখি, বিশ্বের অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া অধিকাংশ লোকই মাংস খায়। এই সব দেখে শুনে মনে হয় মাংস খাওয়ার কোনো দোষ নেই কয়েকটি এমন লক্ষণ মানুষের মধ্যে দেখা যায়, যা দেখে মনে হয় ভগবান মানুষকে মাংসাহারী করেই সংসারে পাঠিয়েছেন।

বিমলঃ যে কাজ অনেক লোক করে অতএব উহা করণীয় বা উত্তম, এর মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। জগতে অধিকাংশ লোকই মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যা আচরণ করে। সত্য কথা বলার মানুষ বা সত্য আচরণ করার মত লোক কয়টি ? অতএব মিথ্যা কথা বলা ভালো এ কোনো যুক্তি নাকি? জগতে পাপীর সংখ্যা অধিক, পুণ্যাত্মার সংখ্যা অল্প, তাই বলে কি পাপীদের প্রশংসা করতে হবে? প্রাথমিক শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক, প্রবেশিকা শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা আরও অল্প, বি. এ. তারও চেয়ে কম, এম.এ. আরও কম। তাই বলে কি এম. এ. দূষ্য? জগতে ভাল এবং সৎ এর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। মন্দ চিন্তাধারা বিস্তৃত হতে সময় লাগে না কিন্তু সৎ হওয়ার জন্য প্রযত্নশীল হতে হয়। বিনা পরিশ্রমেই কাপড় নোংরা হয়ে যায়। কিন্তু সেই নোংরা কাপড়কে ধুয়ে পরিষ্কার করতে পরিশ্রম লাগে। ভগবান মানুষকে মাংসাহারী করে সৃষ্টি করেন নাই, এ বদঅভ্যাস মানুষের নিজের গড়া। বলতো আফিম, ধুতরো এ সব কি খাবার জিনিষ? কিন্তু দ্যাখো, মানুষ তাতেও অভ্যস্ত হয়েছে।

কমলঃ মানুষ যে মাংসাহারী নয় এর প্রমাণ কী?

বিমলঃ এর প্রমাণ মানুষের দেহের গঠনের প্রকৃতি।

■ প্রথমতঃ—মানুষের নখের বা দাঁতের গঠন মাংসাহারী প্রাণীর মত নয়। মানুষ মাংসকে কেটেকুটে, তাতে ঘি, লঙ্কা মশলা মাখিয়ে পাক করে, দাঁতের ও জিভের স্বাদের অনুকূল করার চেষ্টা করে । যারা মাংসাহারী পশু ও পাখি তাদের দাঁত, জিভ, নখ ও ঠোট প্রভৃতি ভগবৎ প্রদত্ত সাধন, কাঁচা মাংস ছিঁড়ে খুড়ে, চিবিয়ে, গিলে খাবার অনুকূলে গঠিত, কিন্তু তা মানুষের অনুকূল নয়।

■ দ্বিতীয়তঃ—যত মাংসাহারী প্রাণী আছে, তাদের শরীর দিয়ে ঘাম বের হয় না, মানুষের শরীর দিয়ে ঘাম বের হয়।

■ তৃতীয়তঃ —যত মাংসাহারী প্রাণী আছে তারা জল খায় চপ চপ করে, আর মানুষ খায় চুমুক দিয়ে।

■ চতুর্থতঃ—মাংসাহারী জরায়ুজ প্রাণী হয়েও জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তারা চোখ মেলে চাইতে পারে না, চোখ জোড়া থাকে এবং বেশ কয়েকদিন পরে চোখ ফোটে। মানুষের কিন্তু তা হয় না। এরূপ আরও যুক্তি দেওয়া যেতে পারে।

কমলঃ মাংসাহারী বলবান ও বীর হয় । মাংসে শক্তিও ভরপুর এরূপ ধারণা আজও অনেকের মনে বদ্ধমূল।

বিমলঃ অধিকাংশ মাংসাহারী দয়াহীন এবং ক্রূর, তারা বীর হয় না। বীরত্ব এক জিনিষ, আর দয়াহীনতা অন্য জিনিষ। হ্যাঁ, তুমি একথা বলতো

পারো যে, লক্ষ লক্ষ মাংসাহারী ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীর হয়েছে। কিন্তু তা মাংস খাওয়ার গুণে সম্ভব হয়নি, তা কোনো কালেও হয় না। বাস্তবিক পক্ষে ওটা শিক্ষা ও সঙ্গতির গুণ। মাংস ভোজনে যদি বীরত্ব জাগ্রত হতো, তাহলে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত, আর সকলকে বীর হতে দেখা যেতো। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু এরা সকলেই মাংস খায়, তথাপি আক্রমণাত্মক-ভাব এবং মার-কাট করার প্রবৃত্তিতে অহিন্দু যতটা অগ্রসর, ভারতের অন্যান্য জাতির মধ্যে তা পাওয়া যায় না। বাস্তবিকপক্ষে বীর তারাই যারা দেশ ও জাতির হিতার্থে নিঃস্বার্থভাবে অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়, তাতে তার প্রাণ যাক বা থাক, সে কখনও পিছু হটে না। কাহারও ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, কাহারও ঘরের মাল লুঠ করে নেওয়া, কাহাকেও ধোঁকা দিয়ে আক্রমণ করে কাহারও পেটে ছোরা বসিয়ে দেওয়া, কাহারও স্ত্রীকে চুরি করে নিয়ে পালান— অনেক গুণ্ডা আছে যারা এসব অপকর্ম করে থাকে—তাদের কি বীর বলবে ? কদাপি নয়, তারা পাপী এবং নিষ্ঠুর অত্যাচারী।

কমলঃ মাংস খেলে রস বৃদ্ধি হয় শুনেছি। বাঘ, নেকড়ে, চিতা প্রভৃতি হিংস্র পশু। এরা বলবান। এরা শুধু মাংস খায়। এরা হাতীকে পর্যন্ত মেরে ফেলতে পারে এই দেখে অনুমান হয় যে মাংসে খুবই শক্তি আছে।

বিমলঃ গরু, ঘোড়া, ষাঁড় প্রভৃতি পশু কি কিছু কম শক্তিশালী? বিশ্বসংসারময় যন্ত্র শক্তির পরিমাণ অশ্ব শক্তির সঙ্গে করা হয়ে থাকে।

শূকর এত বলবান যে, সামনে পড়লে সে সিংহকেও ঘোল খাইয়ে দেয়। দুই সিংহের মধ্যে থেকে একটা শূকর জলপান করতে পারে। সিংহ হাতি অপেক্ষা বুঝি অধিক বলবান, না সে তত বলবান নয়? কখনও কখনও প্রমত্ত বুনো হাতি যখন বনে ঘুরে বেড়ায় তখন বনের পশুকুল ভয়ে পালিয়ে যায়। সিংহ হাতীকে তার সূতীক্ষ্ম দাঁত ও থাবার প্রহারে কাবু করতে পারে ঠিক, কিন্তু শক্তিতে সে হীন। দেখো, দু'জন মানুষ তাদের একজন শক্তিশালী আর অপরজন দুর্বল। যে দুর্বল তার হাতে যদি বল্লম, বর্শা, পিস্তল বা বন্দুক থাকে, সে বলবানকে কাবু করতে এবং তাকে হত্যা করতেও পারবে। তা কেমন করে সম্ভব হয়? কেননা তার কাছে অস্ত্র-শস্ত্রের শক্তি আছে। যদি সিংহের মত হাতীর মুখে সুতীক্ষ্ম দাঁত থাকত, আর ধারাল নখ হতো, আর হাতীর চোখ দুটো ছোট্ট ছোট্ট না হয়ে বড় বড় হতো, তাহলে দেখতে সংসারে হাতী কোনো জীব জন্তুকে পরোয়া করত না। হাতি, উট, মহিষ প্রভৃতি পশু মাংসাহারী নয়, কিন্তু তারা মহাবলশালী। তারা শস্ত্রের অভাবেই বিবশ হয়ে যায়।

তুমি শক্তির কথা কী বলছো, শক্তি সোনা, রূপা, লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুর এক রতি পরিমাণে যা আছে তা মাংসে কোথায়? এমন সব বনস্পতি আজও আছে যার এক মাত্রায় শরীর গরম হয়ে যায় এবং অসীম বল সঞ্চর করতে সমর্থ। মাংসে কি তেমন শক্তি আছে ?

কমলঃ যে দেশে শাক-সব্জী উৎপন্ন হয় না, সেখানে মানুষকে মাংসের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। আইল্যাণ্ড অথবা উত্তর মেরুপ্রদেশের

মানুষকে মাংসের উপর নির্ভর করে থাকতে হয় শুনেছি । তাদের স্বাভাবিক ভোজন মাংস।

বিমলঃ যদি সে দেশবাসীর স্বাভাবিক ভোজন মাংস হয় তাহলে তারা বোধ হয় মানুষ নয় আর যদি বা হয়ও তাহলে মানুষের আকৃতিতে ভিন্ন হতে হবে। তাদের দাঁত এবং নখও মাংস ছেঁড়ার উপযুক্ত হয়ে থাকবে। সেখানকার নর-নারী যদি আমাদের মতই হয়ে থাকে, তাহলে তারা মাংসাহারী হয় কেমন করে? কেননা, ভগবান আমাদের দাঁত, নখ, মাংস খাওয়ার যোগ্য করে তৈরী করেন নাই। হ্যাঁ, একথা হতে পরে যে, তারা মাংস খাওয়া অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে । যেখানে মানুষ পৌঁছেছে, সেখানে প্রত্যেকটি জিনিষও পৌঁছাতে পারে। যদি বলা যায় যে, সেখানে শাক-সব্জী উৎপন্ন করা যায় না, এবং সেখানকার মাটি জীবনের আবশ্যক বস্তু উৎপন্ন করার উপযুক্ত নয়, তাহলে সেখানে বসবাস করা বৃথা। প্রকৃতপক্ষে, মাংসাহারের পুষ্টি সম্বন্ধে যাবতীয় প্রমাণ ভোঁতা এবং ব্যর্থ।

কমলঃ সংসারে আর্থিক প্রশ্নও তো আছে। যেখানে তরিতরকারী কম হয়, সেখানে মাছ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সেখানকার যারা দরিদ্র, তাদের নির্বাহ হয় মাছ ও অন্যান্য পশুর মাংস খেয়ে। যদি মাংস না পাওয়া যায় তাহলে আর্থিক সমস্যা কত তীব্রতর হতে পারে—অনুমান করো।

বিমলঃ সংসারের যে কোনো দেশের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। দেখবে, যখনই দেশে কোনো প্রশ্ন ওঠে, তা উঠে ডাল-ভাতের সমস্যার প্রশ্ন। দেশে ডাল, তরকারী, চাটনী, মুরবা, ও দই-বড়া বা মাংসের প্রশ্ন নেই। কেননা, ঐগুলি অন্নের সঙ্গে যুক্ত করে খাওয়ার প্রয়োজন আছে মাত্র। ঐগুলি মুখের চাট বা আস্বাদের জন্য, জিভকে প্রসন্ন করার জন্য। পেট ভরার জন্য বা শক্তি প্রদান করার জন্য নয়। খাদ্যের মধ্যে অন্ন প্রধান, আর সমস্ত গৌণ। শরীরের পক্ষে সর্বপ্রথম প্রয়োজন অন্ন এবং সংসারে এর প্রয়োজনের প্রশ্ন আজও রয়েছে। আর্থিক প্রশ্ন সদাই অন্নের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, আর এ সম্বন্ধ চিরকাল থাকবেও।

কমলঃ আচ্ছা, যদি মাংস খাওয়াই যায়, তাতে ক্ষতিটা কী?

বিমলঃ মাংসাহারী কখনও ঈশ্বর ভক্ত হতে পারবে না। কেননা, মাংস তামসিক ভোজন, মাংস মানুষের চিন্তাধারাকে তামসিকর্তায় আচ্ছন্ন করে দেয়। সংসারে যারা ভগবানের প্রকৃত ভক্ত হয়েছে, হয় তারা মাংস খেতো না, আর যদি বা খেতো তা পরবর্তী জীবনে নিশ্চয়ই ত্যাগ করেছিল। এই ভাবে তারা অন্তরাত্মার জ্যোতি দর্শনে সমর্থ হয়। একথা সত্য যে, যে মাংসাহারী নয় সে ঈশ্বর ভক্ত নাও হতে পারে। যে মানুষ নিষ্পাপ এবং নিরামিষ ভোজী সেই ব্যক্তিই ঈশ্বর লাভ করতে পারে। অতএব মাংস ভক্ষণ সদা নিষিদ্ধ।

কমলঃ আচ্ছা দাদা ! ঈশ্বর হতেই কি সমস্ত উৎপন্ন হয়েছে?

বিমলঃ আজকের মত এ প্রশ্ন থাক । আগামীকাল এ বিষয়ে আলোচনা হবে।

সমগ্র সৃষ্টি কি ঈশ্বর রচিত?

(দ্বাদশ দিন)

কমলঃ এই সমস্ত সংসার কি ঈশ্বরের রূপ?

বিমলঃ না, এ সংসার প্রকৃতির রূপ। ঈশ্বর রূপ রহিত।

কমলঃ মহান বুদ্ধিমান এবং দার্শনিক বিদ্বান ব্যক্তিরা একথা বলেন যে, সমগ্র সংসার ঈশ্বর রচিত। ঈশ্বর হতেই আকাশ, আকাশ হতে বায়ু, বায়ু হতে অগ্নি, অগ্নি হতে জল, জল হতে পৃথিবী, পৃথিবী হতে অন্ন, ওষধি তথা অনেক প্রকারের প্রাণী উৎপন্ন হয়েছে।

বিমলঃ একথা মিথ্যা। ঈশ্বর সৃষ্টির উৎপত্তি কর্তা, তিনি স্বয়ং কার্য নহেন। সৃষ্টি উৎপত্তির তিনটি কারণ, এবং সেই তিনটি কারণই অনাদি। ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি এই তিনটি পদার্থ অনাদি। 'ঈশ্বর' সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ, 'প্রকৃতি' উপাদান কারণ এবং কাল ও দিশা প্রভৃতি 'সাধারণ' কারণ। কেননা সৃষ্টির সমস্ত কার্যে এগুলি সামান্য কারণ যার দ্বারা তৈরী করলে কিছু তৈরী হয়, না তৈরী করলে তৈরী হয় না, তাকে নিমিত্ত কারণ বলে। যথা,— স্বর্ণকার অলংকার তৈরী করেছে। এখানে স্বর্ণকার কর্তা অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ, আর সোনা উপাদান কারণ। স্বর্ণকারের তৈরী করার দরুণ অলংকার তৈরী হয়েছে, না করলে তৈরী হতো না। যদি ঈশ্বর হতে

আকাশ সৃষ্টি হয়, তাহলে শব্দ আকাশের গুণ হওয়ায় শব্দ ঈশ্বরের গুণ হবে। কিন্তু ঈশ্বরের গুণ তো শব্দ নয়, তাহলে আকাশে শব্দ এলো কোথা থেকে? কারণের গুণ কার্যে অবশ্যই থাকে। যদি সোনা হতে অলংকার তৈরী হয়, তাহলে সোনার গুণ অলংকারে থাকা উচিত। আর এক কথা, ঈশ্বরেই যদি শব্দের অভাব হয়, তাহলে আকাশে শব্দ আসবে কোথা হতে? অভাব হতে কোন কালেও ভাবের উৎপত্তি হয় না। অতএব প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বর হতে আকাশ হয় নাই। এইভাবে আকাশ হতে বায়ু সৃষ্টি হয় নাই, কেননা বায়ুর ধর্ম স্পর্শ গুণ কোথা হতে এল? বায়ু হতে অগ্নি হয় নাই, কেননা অগ্নির গুণ রূপ। বায়ুতে রূপ নেই, তাহলে অগ্নিতে রূপ এলো কোথা হতে? ওইভাবে সমস্ত তত্ত্বকে জানা উচিত। এই সব তত্ত্ব-সত্ত্ব, রজঃ ও তম মূল প্রকৃতি হতেই সৃষ্টি। আর তাদের নিমিত্ত কারণ পরমাত্মা, তিনি এই বিশ্ব সংসারের স্রষ্টা।

কমলঃ পরমাত্মা যখন জগৎ রচনা কালে প্রকৃতির সাহায্য নিয়েছেন, তখন বোঝা গেল যে তিনি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল, কেননা তিনি প্রকৃতির সাহায্য গ্রহণ ছাড়া সৃষ্টি রচনা করতে পারেন না।

বিমলঃ পরমাত্মা প্রকৃতির সাহায্য প্রার্থী নহেন, বরং তিনি প্রকৃতিকেই কাহারও সাহায্য গ্রহণ ব্যতীতই জগৎ আকারে রূপ দান করেছেন। তিনি স্বীয় কার্য সিদ্ধ করার জন্য কোনো উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করেন না। প্রকৃতি সাধন নহে 'কর্ম'—প্রকৃতির উপরেই পরমাত্মার ক্রিয়ার ফল দৃষ্টি হয়। যেমন নাকি, গদাধর পশুপতিকে প্রহার করল, এখানে গদাধর

‘কর্তা’ পশুপতি ‘কর্ম’, আর প্রহার হল ‘ক্রিয়া’ যদি কেহ বলে যে, গদাধর পশুপতিকে প্রহার বিষয়ে পশুপতির উপর নির্ভরশীল। তাহলে জিজ্ঞাসা করি, এ কি বুদ্ধিমানের প্রশ্ন হলো? গদাধর ব্যতীত পশুপতিকে প্রহার করা কথাটা কি যুক্তিযুক্ত হলো ? আমি যদি বলি, আমি কমলাকে পাঁচ টাকা দিয়েছি, একথা শুনে একজন বলল তুমি কমলাকে টাকা দেওয়া বিষয়ে টাকার উপর নির্ভরশীল। বলতো, এ কি একটা কথা হলো? টাকা দেওয়া বিষয়ে টাকার উপর নির্ভরশীলতা এ কেমন কথা? বোধ হয় তোমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে মারবে সে নেই, আর ঈশ্বর তাকে মেরে ফেললেন। খাবার মানুষ নেই আর ঈশ্বর তাকে খাইয়ে দিলেন। কাঁদার মানুষ নেই, ঈশ্বর তাকে কাঁদিয়ে দিলেন। প্রকৃতি নেই আর প্রাকৃতিক জগৎ রচনা হলো। হায়, এ রকম মানুষকে পাগল ছাড়া আর কে কী বলবে?

কমলঃ আমি শুনে আসছি যে সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে কেবলমাত্র ঈশ্বরই ছিলেন, কোনো পদার্থ ছিল না। তিনি আপন ইচ্ছায় জগৎ রচনা করলেন। নিজের জন্য না অপরের জন্যে? যদি বলো যে, নিজের জন্যে। তাহলে বোঝা গেল যে, ঈশ্বরের নিজের সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। যার প্রয়োজন আছে তাকে পূর্ণ বলা যায় না। কেননা প্রয়োজন থাকাটাই অপূর্ণতার প্রমাণ।

বিমলঃ **যদি বলো যে ঈশ্বর জীবের জন্যে সৃষ্টি করেছেন তাহলে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবকেও স্বীকার করতে হবে।** এ অবস্থায় সৃষ্টির পূর্বে কেবল ঈশ্বরই ছিলেন একথা মিথ্যা হয়ে যাবে।

কমলঃ তিনি নিজের লীলা দেখবার জন্য জগৎ রচনা করেছেন।

বিমলঃ তিনি নিজের লীলা কাকে দেখাবেন?

কমলঃ নিজে নিজেকেই লীলা দেখাবেন।

বিমলঃ নিজে নিজেকে আপন লীলা কেনো দেখাবেন?

কমলঃ নিজের আনন্দের জন্য লীলা দেখাবেন।

বিমলঃ সৃষ্টি রূপ লীলা প্রদর্শনের পূর্বে ঈশ্বরে সেই আনন্দ ছিল, না ছিল না? যদি বলো ছিল, তাহলে লীলা দেখানোর আনন্দ হলো কেমন করে? যদি বলো ছিল না, তা হলে ঈশ্বরের লীলার আনন্দ কম ছিল। অতএব প্রমাণিত হলো যে, যখন লীলা দেখালেন তখন সৃষ্টি- রূপ লীলার আনন্দ পরমাত্মায় বৃদ্ধি হলো। যাতে হ্রাস বৃদ্ধির দোষ থাকে, সেই পদার্থের গুণ অনাদি ও অনন্ত হতে পারে না। আর যখন অনন্ত হলো না, সেক্ষেত্রে গুণের যে গুণী ঈশ্বর, তিনি অনাদি ও অনন্ত হবেন কেমন করে?

কমলঃ আচ্ছা, আমি যদি স্বীকার করি যে লীলা প্রদর্শন করা তাঁর স্বভাব।

বিমলঃ যদি এভাবে মানতে থাক, তাহলে রাগ, দ্বেষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, হর্ষ, শোক, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মরণ, অন্যায়, চৌর্য, ছিনতাই, হিংসা,

ব্যাভিচার প্রভৃতি গুণ-অবগুণ সমস্তই ঈশ্বরীয় লীলা ধর্ম বলে স্বীকার করতে হবে । কেননা, সৃষ্টিরূপী লীলা এতে সম্মিলিত । এই অবস্থায় জগতে পাপ, পুণ্য, দুরাচার, সদাচার, ধর্ম, অধর্ম বলে কোনো কিছুই থাকবে না। ঐ সমস্তই পরমাত্মার স্বাভাবিক অঙ্গ হয়ে যাবে । বেদ, শাস্ত্র, যম, নিয়ম, প্রভৃতি সাধন সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। মানব জীবনের উদ্দেশ্য বলে কিছুই থাকবে না । কীসের জন্য ত্যাগ আর তপস্যা করা, তাকেই বা কেনো করবে? কেননা ঈশ্বর যে, নিজেই নিজেকে স্বভাব অনুযায়ী লীলা দেখিয়েছেন । এই অবস্থায় কেই বা পাপী, আর কেই বা পুণ্যাত্মা? কোন্‌টা কর্ম, আর কোনটাই বা কর্মের ফল, সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে ।

কমলঃ আচ্ছা, আপনার সিদ্ধান্ত অনুসারে বলুন পরমাত্মা সৃষ্টি রচনা করেন কেনো?

বিমলঃ জীবের কল্যাণার্থে পরমাত্মা সৃষ্টি রচনা করে থাকেন তিনি ন্যায়কারী এবং দয়ালু। তাঁর নিজের কোনো প্রয়োজন নেই। দয়া ও ন্যায় করা তাঁর স্বভাব।

কমলঃ পরমেশ্বর যদি জীবের কল্যাণার্থে সৃষ্টি রচনা করে থাকেন তাহলে সেই সৃষ্টিতে সুখ-দুঃখ ও ভাল-মন্দ দেখতে পাই কেনো?

বিমলঃ সৃষ্টিতে ভালো-মন্দ যাই দেখি না কেনো, সুখ-দুঃখ যাই অনুভব করি না কেনো, বাস্তবিক পক্ষে তা জীবেরই ভালো মন্দ কর্মের ফল। জীব আপন অজ্ঞানতা বশতঃ সৃষ্টিতে দুঃখ ভোগ করে থাকে । অন্যথা সৃষ্টিতে

না আছে ভাল কিছু, আর না আছে কিছু মন্দ। জীব স্বীয় অল্পজ্ঞতা বশতঃ বিপরীত কর্ম করে দুঃখ ভোগ করে এবং পরমাত্মার ন্যায়ানুসারে অনেক যোনিতে ভ্রমণ করে । পরমাত্মা কাহাকেও দুঃখ দেন না। জীবের অজ্ঞানতাই দুঃখের কারণ। বাস্তবিকতাকে না জেনেই মানুষ দুঃখ ভোগ করে।

কমলঃ পরমাত্মা কি জীবকে সৃষ্টি করেন নাই?

বিমলঃ জীব অনাদি । অতএব তাকে সৃষ্টি করার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে?

কমলঃ যদি ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতিকে সৃষ্টি না করে থাকেন, তাহলে তার উপর তিনি অধিকার ফলান কেনো?

বিমলঃ এ প্রশ্নটা কী রকম জানো? কোনো পাঠশালায় একজন গিয়ে গুরুমশাইকে বিদ্যার্থীদের উপর শাসন করতে দেখে বললেন— "গুরুমশাই যখন বিদ্যার্থীদের জন্ম দেন নাই এ অবস্থায় তাদের উপর শাসন করার তাঁর কীসের অধিকার?" যদি প্রকৃতি অজ্ঞ ও জীব অল্পজ্ঞ হয় এদের দুজনের উপর সর্বজ্ঞের অধিকার স্থাপন করা অতি স্বাভাবিক কথা। পাঠশালায় বিদ্যার্থীদের উপর গুরুমশায়ের শাসন বিদ্যার্থীদের উন্নতির যেমন কারণ, তেমনি সৃষ্টি রূপ পাঠশালায় জীবের ঈশ্বরের অধীনে থাকা তাদের উন্নতির কারণ নয় কি? পরমাত্মা রূপী গুরুমশায়ের বেদ জ্ঞান দ্বারা জীব ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক উন্নতি করে থাকে।

কমলঃ যদি মনে করা যায় যে, পরমাত্মা জীবকে নির্মাণ করেছেন, তাহলে আপত্তি কি থাকতে পারে?

বিমলঃ একথা স্বীকার করলে জীবের কর্ম করার স্বতন্ত্রতা থাকবে না ভাল-মন্দ কর্মের উত্তর দায়িত্ব ঈশ্বরের উপর এসে পড়বে। জীব পাপ-পুণ্য কর্মের ভাগী হবে না, কেননা, পরমাত্মা জীবকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মধ্যে ভাল-মন্দ করার যোগ্যতা দিয়েছেন। তাই জীব যদি ভাল-মন্দ কর্ম করে, তাহলে তাতে তার নিজের দোষ কোথায় থাকল? তুমি কি ভেবেছ জীবকে সৃষ্টি করার পূর্বে ঈশ্বর তাকে, এমন যোগ্যতা দিতেন যে, সে যেন মন্দ কর্ম করতেই না পারে ? এইসব কারণেই জীব অনাদি এবং সে কর্মে স্বতন্ত্র। কেবল পরমাত্মার ব্যবস্থানুসারে তাকে কর্মফল ভোগ করার জন্য পরাধীন থাকতে হয়।

কমলঃ কেউ কেউ বলে থাকেন, জীব নাকি ব্রহ্মেরই অংশ।

বিমলঃ অংশ অংশীর ভাব সাবয়ব অর্থাৎ সাকার আদি অনিত্য পদার্থ সমূহে হয়ে থাকে। নিরবয়ব জীব ও ব্রহ্ম এরা উভয়েই অনাদি।

কমলঃ কেউ কেউ বলে থাকেন, জীব ব্রহ্ম হতেই উৎপন্ন হয়েছে এবং অবশেষে ব্রহ্মেই লয় হয়ে যাবে।

বিমলঃ একথা স্বীকার করলে জীব অনাদি এবং সনাতন থাকবে না। কারণের মধ্যে কার্য সর্বদাই লয় হয়ে থাকে, যথা মৃত্তিকা রূপ কারণে ঘট রূপী কার্য লয় হয়ে থাকে। জীব ব্রহ্মের কার্য নয়। সে নিত্য ও স্বতন্ত্র। যা

নিত্য সে তার আপন অস্তিত্ব হারিয়ে কোথাও কোনো পদার্থে লয় হয়ে যাবে কেমন করে?

কমলঃ বাস্তবিক পক্ষে বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে, জীব তো ব্রহ্মই, সে নিজের অজ্ঞানতা দোষে নিজেকে জীব মনে করে।

বিমলঃ এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মেও অজ্ঞানতা বিদ্যমান। যদি ব্রহ্ম আপন অজ্ঞানতা বশতঃ জীব হয়ে থাকে, তাহলে জীব কার কাছে জ্ঞান লাভ করবে? ব্রহ্মের নিকট হতে সে জ্ঞান লাভ করতে পারবে না, কেননা ব্রহ্ম অজ্ঞানতার অধীনে।

কমলঃ তাহলে কি ব্রহ্ম হতে জীবের সৃষ্টি হয় নাই। আর জীবনের শেষ পর্য্যন্ত জীব ব্রহ্ম হতেও পারবে না।

বিমলঃ দ্যাখো, যা নির্মিত হয়, তা ব্রহ্ম হতে পারে না। ব্রহ্ম তো অনির্মিত বস্তু। এই হিসাবে জীবও নির্মিত নয়। তাই উক্ত দুই তত্ত্বই নিত্য।

কমলঃ কেউ কেউ বলেন, এ সংসার মিথ্যা, ব্রহ্ম ই একমাত্র সত্য, মায়াকে অনির্বচনীয় বলা হয়। কেননা মায়া ত্রিকাল মধ্যে এক রস থাকে না, এইজন্য তাকে সৎ বলাও যায় না। আর মায়াকে অসৎ একারণে বলতে পারা যায় না, যেহেতু জগতে তার কর্ম দৃষ্ট হয়।

বিমলঃ জগৎ সৎও নয়, আর অসৎও নয়। বরং বলা যায় জগৎ অনিত্য অর্থাৎ পরিবর্তনশীল। যারা মায়াকে অনির্বচনীয় বলে থাকে, তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, মায়াকে প্রমাণ সিদ্ধ স্বীকার কর, না—প্রমাণ

ব্যতীতই স্বীকার কর? যদি প্রমাণ সিদ্ধ স্বীকার কর তাহলে মায়া প্রমেয় হয়ে যাবে, কেননা প্রমাতা প্রমাণ দ্বারা তাকে জেনেছেন, তার নির্বাচন হয়ে গেল। যদি বল মায়াকে প্রমাণ ব্যতীতই স্বীকার করি, তাহলে, মায়াকে জানলে কী করে যে, এ মায়া। অতএব মায়া অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য অনিত্য আর প্রকৃতি নিত্য।

কমলঃ কেউ কেউ বলে থাকেন—এই যে জগৎটা দেখছ এটা ভ্রম। বাস্তবিক পক্ষে এর কোনো সত্ত্বা নেই। যথা রজ্জুতে সর্প ভ্রম। ঠিক তেমনি ব্রহ্মে মায়ার প্রতীতি হয়, বাস্তবিক পক্ষে মায়া বলে কিছু নেই। যেমন ঝিনুকে রূপো নেই, রজ্জুতে সাপ নেই তথাপি ভ্রম হয়ে যায় এইভাবেই ব্রহ্মে মায়ার ভ্রম হয়ে থাকে।

বিমলঃ যখন ব্রহ্ম ছাড়া কোনো বস্তু নেই তাহলে এই ভ্রমটা হচ্ছে কার? কেননা, কীসে কার, এবং কীসের ভ্রম হচ্ছে? আর এক কথা, ভ্রম সমান বস্তুতেই হয়ে থাকে। যথা রজ্জুতে সর্প ভ্রম হওয়া সম্ভব, কিন্তু ঘটে তা সম্ভব নয়। ঝিনুক রূপোর ভ্রম হওয়া সম্ভব, কিন্তু সন্দেশে তা সম্ভব নয়। যখন ব্রহ্ম চৈতন্য, জগৎ জড়, এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে সমতার অভাব থাকার ভ্রম হবে কেমন করে? ব্রহ্ম নিরাকার, আর জগৎ সাকার ব্রহ্ম নিত্য, জগৎ অনিত্য, এই অবস্থায় ভ্রম হবে কেমন করে?

কমলঃ ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোনো বস্তু দ্বারা কী সম্ভব?

বিমলঃ ব্রহ্ম ছাড়া যদি অন্য বস্তু না থাকে, তাহলে ব্রহ্ম কাকে বলা হবে? ব্রহ্মের অর্থ বৃহৎ—বড় । যদি ছোট না থাকে তো বড়র জ্ঞান হবে কেমন করে? যদি তেতো না থাকে, তো মধুর জ্ঞান হবে কেমন করে? আর এক কথা, ব্রহ্ম এবং আত্মা, এদের মধ্যে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ চিরকালের । যদি ব্যাপ্য না থাকে তাহলে কেমন করে কে ব্যাপক হবে?

কমলঃ দাদা ! এ বিষয়ে এখানেই শেষ করা যাক্। তোমার যুক্তি অনুসারে এই জানতে পারলাম যে, ব্রহ্ম জীব এবং প্রকৃতিকে নিত্য স্বীকার করলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় । আর অন্য কোনো প্রকার ‘মতবাদ’ এই সৃষ্টির সম্যক্ সমাধান করতে পারবে না ।

তোমার অসীম কৃপা, তুমি দীর্ঘদিন আলোচনা করে আমার মনের সমস্ত সংশয় নিরাকরণ করে দিলে । আমি তোমার উপকার কোনো দিনও ভুলব না ।

--------------- সমাপ্ত ---------------

আর্য সমাজের নিয়ম

১। সমস্ত সত্যবিদ্যা এবং যাহা পদার্থ বিদ্যা দ্বারা জানা যায়, সে সকলের আদি মূল পরমেশ্বর।

২। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান, ন্যায়কারী, দয়ালু, অজন্মা, অনন্ত, নির্বিকার, অনাদি, অনুপম, সর্বাধার, সর্বেশ্বর, সর্বান্তর্যামী, অজর, অমর, অভয় নিত্য পবিত্র ও সৃষ্টীকর্ত্তা তাঁহারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

৩। বেদ সমস্ত সত্য বিদ্যার পুস্তক, বেদের পঠন-পাঠন ও শ্রবণ-শ্রাবণ আর্য্যদের পরম ধর্ম।

৪। সত্য গ্রহণে ও অসত্য পরিত্যাগে সর্বদা উদ্যত থাকিবে।

৫। সমস্ত কর্ম ধর্মানুসারে অর্থাৎ সত্য ও অসত্য বিচার বিবেচনা করিয়া করা উচিত।

৬। সংসারের উপকার করা এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ শারীরিক, আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি করিবে।

৭। সকলের সহিত প্রীতি পূর্বক ধর্মানুসারে যথাযোগ্য রূপে ব্যবহার করিবে।

৮। অবিদ্যার নাশ ও বিদ্যার বৃদ্ধি করিবে।

৯। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন উন্নতিতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া সকলের উন্নতিতে আপন উন্নতি জ্ঞান করিবে।

১০। সকল মনুষ্য সামাজিক সর্বহিতকারী নিয়ম প্রতিপালনে পরতন্ত্র এবং প্রত্যেক ব্যক্তিগত হিতকারী নিয়ম প্রতিপালনে স্বতন্ত্র থাকিবে।